রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে সাহিত্য-শিল্পভাবনার স্বরূপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম. ফিল.
ডিগ্রি লাভ করার জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০৫

Dhaka University Library
402474
402474
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

উপস্থাপনকারী
সুধীর কুমার সরকার
রেজিস্ট্রেশন নং-৪২
সেশন : ২০০০-২০০১
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ৮৬২৪৬৬৬ (বা)
৯৬৬১৯০০-৫৯/৪২০২ (অ)
০১৫২৪১৪১৪৩ (মো)

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সুধীর কুমার সরকার আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য 'রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে সাহিত্য-শিল্পভাবনার স্বরূপ' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় অথবা অংশ-বিশেষ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেয়া হয় নি।

৩/১/২০০৬

ড. সৌমিত্র শেখর

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম. ফিল. পর্যায়ের গবেষণাকর্মে আমার গবেষণা-শিরোনাম : 'রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে সাহিত্য-শিল্পভাবনার স্বরূপ'। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি উক্ত গবেষণার ফসল। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর।

বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য ১৯৪৭ সালের পর মৌলিক ও গবেষণা - এই দুই ধারায় স্পষ্ট বিভক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে মৌলিক প্রবন্ধের ধারায় গোড়াপত্তনকারী হাতে গোনা কয়েকজন লেখকের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন একজন। ব্যক্তিগত জীবনে সাংবাদিক ও রাজনীতিক রণেশ দাশগুপ্ত নিজস্ব মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ সময় প্রচুর মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। ষাট ও সত্তর দশকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের প্রায় সব পত্রিকা ও ছোট কাগজেই রণেশ দাশগুপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। এর অনেকগুলোই আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। তবে, অনুসন্ধান করে এগুলোর বেশ কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে। রণেশ দাশগুপ্তের এই অগ্রন্থিত ও গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধাবলিতে তাঁর বিচিত্র বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা প্রকাশিত। রাজনীতি যেহেতু তাঁর মজ্জাগত, শোষণমুক্তির মন্ত্র যেহেতু তাঁর শোণিতে প্রবাহিত, সেহেতু তাঁর চিন্তায় বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেছে, অন্যান্য সমাজবাদী বা কমিউনিস্টদের চিন্তার সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের ভাবনার বেশ কিছু পার্থক্য। এই পৃথকতাটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাতন্ত্র্য-অভিলাষী। রণেশ দাশগুপ্তের চিন্তার বিচিত্র বিচ্ছুরণ থেকে শুধু 'সাহিত্য-শিল্পভাবনা' নিয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে।

402474

বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন তথ্য-সংগ্রহ ও অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর। গবেষণা-কর্মে আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। প্রথমে তিনি আমাকে সঙ্গে করে বাংলা একাডেমীর পত্র-পত্রিকা রক্ষণাগারে নিয়ে যান। সেখান থেকে আমি রণেশ দাশগুপ্তের বহু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ উদ্ধার করি। এরপর তাঁর নির্দেশে তাঁর দেয়া পত্র সহকারে কলকাতায় যাই। সেখান থেকে রণেশ দাশগুপ্তের নিজের এবং তাঁর উপর রচিত একাধিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করি। কলকাতায় রণেশ দাশগুপ্তের সান্নিধ্য-ধন্য অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আহরণ করি। এ সময় অধ্যাপক নরহরি কবিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁর সম্পাদিত

Dhaka University Institutional Repository

'মূল্যায়ন' পত্রিকা থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ ছাড়া অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী, মাসিক 'কবিতা সীমান্ত' পত্রিকার সম্পাদক দীপেন রায় প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করেও উপকৃত হয়েছি। পরবর্তীকালে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. তাইবুল হাসান খানের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে রণেশ দাশগুপ্তের বেশ কয়েকটি অগ্রন্থিত প্রবন্ধের সন্ধান লাভ করি। এই গবেষণা-কর্ম সম্পাদন করার জন্য বিভিন্নজনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছাড়াও সি.পি.বি-র কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার এবং নারায়ণগঞ্জ আলী আহম্মদ চুন্‌কা পাঠাগার ব্যবহার করেছি।

এম. ফিল. প্রথম পর্বে আমার কোর্স শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। ক্লাস করার সময় তাঁরা আমাকে গবেষণার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. সৈয়দ আকরম হোসেন ও ড. রফিকউল্লাহ্ খানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তাঁরাও আমাকে বর্তমান গবেষণার কাজে অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্র ও পদ্ধতি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমার কর্মক্ষেত্র নারায়ণগঞ্জ জেলার দেলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের প্রতি, যাঁরা সহকারী প্রধান শিক্ষকের মত একটি প্রশাসনিক ও একাডেমিক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পরও আমাকে কিছু সময়ের জন্য 'শিক্ষা-ছুটি' অনুমোদন করেন। এই ছুটি অনুমোদিত হওয়ায় আমার পক্ষে গবেষণা-কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সহজ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ৪
রণেশ দাশগুপ্ত : জীবন, সমকাল ও মানস

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৫
প্রবন্ধসাহিত্য: সূচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ : পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশে প্রবন্ধসাহিত্য
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবন্ধসাহিত্য

তৃতীয় অধ্যায় ৬৭
রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধে বিষয়বৈচিত্র্য

চতুর্থ অধ্যায় ৯০
প্রথম পরিচ্ছেদ : সাহিত্য-ভাবনা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিল্প-চিন্তা

উপসংহার ১৩৮

নির্ঘণ্ট ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

রণেশ দাশগুপ্ত : জীবন, সমকাল ও মানস

জীবন

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে রণেশ দাশগুপ্ত একটি বিশিষ্ট নাম। চল্লিশের দশকে ঢাকায় যে প্রগতিশীল সাহিত্যিক আন্দোলন গড়ে ওঠে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন এর অন্যতম সংগঠক। শুধু সংগঠক হিসেবেই নয়, সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিশেষ ধারার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তিনি স্মরণীয়।

রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম হয়েছিল ১৫ই জানুয়ারি, ১৯১২ (১লা মাঘ, ১৩১৯) সালে আসামের ডিব্রুগড়ে। পিতার নাম অপূর্বরত্ন দাশগুপ্ত এবং মাতার নাম ইন্দুপ্রভা সেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) জেলার লৌহজং থানার অন্তর্গত গাউরদিয়া (গাউপাড়া) গ্রামে। ছোটবেলা তাঁকে খোকা নামে ডাকা হতো বলে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। তিনি ছিলেন মাতা-পিতার প্রথম পুত্র, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান। সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন :

> "রণেশদা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, সার্টিফিকেট নেম ছাড়াও তো অনেকের নিক নেম থাকে। আপনার আছে কি ? বললেন, হ্যাঁ, আমারও আছে : 'খোকা'। ছেলেবেলাতে ওই নামেই আমাকে ডাকা হতো। তবে মনে নেই কে রেখেছিলেন- বাবা, না মা।---
> : পরিবারের আপনি তো বড় শুনেছি-
> : না-না ঠিক বড় নয়, বড় ভাই। আমার বড় এক দিদি ছিলেন। চার ভাই পাঁচ বোনের মধ্যে আমি মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান কিন্তু প্রথম পুত্র।"[১]

---

১. ড. সৌমিত্র শেখর গৃহীত সাক্ষাৎকার,রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে শেষ আলাপচারিতা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্তের জীবন বৈচিত্র্যময়। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি বড় হতে থাকেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড়। ক্রীড়াকুশলতার সুবাদে তিনি চাকরি নিয়ে বিহারে চলে যান। অপূর্বরত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবারণ দাশগুপ্ত (১৮৬৭-১৯৩৫) বিহারের পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজসচেতন ও রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে তিনি বিহারের কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। নিবারণ দাশগুপ্তই বিহারে রণেশ দাশগুপ্তের পিতার চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন। রণেশ দাশগুপ্তের পিতার কর্মস্থল ছিল রাঁচির ডুরাণ্ডায়। ডুরাণ্ডার সরকারি কোয়ার্টারেই রণেশ দাশগুপ্তের শিশুকালের আনুমানিক ৪ বছর কেটেছে। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথন থেকে জানা যায় :

> "খুব ধোঁয়াটে ধরণের মনে পড়ে এই চার বছরের শেষের দিকের কিছু কথা।--- শৈশবের এই আবাসের নাম ছিল **64 Quarters**। ব্যারাকের ধরণের সারি সারি চৌষট্টিটা বাড়ি ছিল এই আবাসনে ; এই জন্যই নাম **64 Quarters**। মা, আমার পাঁচ বছরের বড় দিদি প্রতিভা (ডলি), ছোটবোন শেফালী (খুকী) ; বাড়ীর কাজের লোক যার কাজ ছিল বাসন মাজা এবং ছোট ভাই ছুটু (অজিত), প্রতিবেশী জবরদস্ত হাঁক-ডাক করা বছর তিরিশেক বয়সের অমৃত বাবু- এরাই ছিল তখন আমার চেনা মানুষ। অর্থাৎ বুঝতে পারা যায়, সেই সময়টা ছিল প্রশান্ত রোমাঞ্চকর কোনো ঘটনার ছায়া পড়েনি আমার সেই শৈশবে। ধু-ধু করে এখন চোখে ভাসে **64 Quarters** এর পাশে উঁচু পদের কর্মচারীদের জন্য মানে সাহেবদের জন্য তৈরি একটা বাংলো থেকে নালির চোখে ধুলো দিয়ে ফুল ছিড়ে নিয়ে আসার ছবি।"[২]

রণেশ দাশগুপ্তকে ৫বছর বয়সে (১৯১৭) রামপদ পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়া হয়। তিনি থাকতেন পুরুলিয়ায় জেঠামশাই নিবারণচন্দ্রের আবাসে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি পিতার সঙ্গে রাঁচিতে ফিরে যান এবং সেখানে রাঁচি জেলা স্কুলে ভর্তি (১৯২১) হন। স্কুল জীবন থেকেই তাঁর মনে রাজনীতি-ভাবনা চলে আসে এবং জেঠামশাইয়ের রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রভাবিত হন। নিবারণ দাশগুপ্ত চাকরি ছেড়ে (১৯২১) দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী কয়েকজন কর্মী নিয়ে একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন 'শিল্পাশ্রম' নামে। এখানে সাবান, দেশলাই প্রভৃতি কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হলেও এ আশ্রমে মূলত বিপ্লবী

---

২. রণেশ দাশগুপ্ত, কখনো চম্পা কখনো অতসী, ১৯৯৮, সাহিত্য প্রকাশ ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ; পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মত বিনিময় ঘটতো। রাঁচিতে 'তরুণ সংঘ' নামে একটি রাজনৈতিক সংঘ গড়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতা ড. পূর্ণচন্দ্রের ছেলে প্রতুল মিত্র এ সংঘের নেতৃত্ব দিতেন। এখানে শাসন, শোষণ, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে রাজনৈতিক আলোচনা হতো। রণেশ দাশগুপ্ত এসব আলোচনায় যোগ দিয়ে সাম্যবাদী চিন্তা তথা মার্কসীয় চেতনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। নিবারণ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে স্বদেশী-চেতনার আলোকে 'মুক্তি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। রণেশ দাশগুপ্ত নিয়মিতভাবে এ পত্রিকা পড়তেন। এ পত্রিকা পাঠে তাঁর স্বদেশী-ভাবনা আরও গভীর হয়ে ওঠে। তাঁদের গোটা পরিবারই স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অজয় রায়ের বক্তব্য থেকে জানা যায় :

> "রণেশদা'দের তৎকালীন পরিবারের সবাই ছিলেন কমিউনিস্ট। রণেশদার এক বোন ইলা তখন ছাত্র-ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী ছিল (বোধ হয় নামটা ইলাই ছিল)। এ সবই ছিল রণেশদার প্রভাবে। রণেশদার কাছে মার্কসবাদ শুধুমাত্র রাজনীতির হাতিয়ার ছিল না, তা ছিল সার্বিক অর্থে জীবনদর্শন। মার্কসবাদের প্রবহমান স্রোতে তিনি যে পুরোপুরি অবগাহন করেছিলেন এবং এই স্রোতধারায় তিনি যে তাঁর জীবনাচার থেকে শুরু করে তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি দিয়ে অন্যদেরও সমভাবে আকৃষ্ট করতেন তা বারে বারেই দেখেছি। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তাঁর এই উপলব্ধি বাস্তবায়নের হাতিয়ার। কোনদিনই তাঁর উপলব্ধির উর্ধ্বে উঠতে পারিনি। নিজের উপলব্ধি থেকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নিয়েছিলেন।"[৩]

এভাবেই রাজনীতিচিন্তা তাঁর মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯২৯ সালে তিনি রাঁচি জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন। রাঁচিতে কোন ভাল কলেজ না থাকায় তিনি বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে (১৯২৯) ভর্তি হন। ছাত্রাবাসে থাকা অবস্থায় তিনি 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্র-ধর্মঘট সংগঠনের কারণে তিনি বাঁকুড়া কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি (১৯৩০) হন। এ কলেজে অধ্যয়নকালে, মার্কসপন্থী ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এতে উভয়ের মধ্যে মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করার দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়। সিটি কলেজে পড়াশোনাকালে 'অনুশীলন সমিতি'র অনিল দাশগুপ্ত তাঁর সঙ্গে পুনঃযোগাযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় :

---

৩. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ, ২০০২, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা (অজয় রায় রচিত প্রবন্ধ 'রণেশদা, রণেশ দাশগুপ্ত ও রাজনীতি') ; পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

"অনুশীলন সমিতির 'যুগবাণী সাহিত্যচক্র' ছিল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটা ছোট্ট দোকানের মধ্যে। সেখানে আমরা আলাপ-আলোচনার জন্য আসতাম। যুগান্তর দলের আস্তানা ছিল কলেজ স্ট্রিটের সরস্বতী লাইব্রেরি। যুগবাণী সাহিত্য-চক্রে শ্রী দেবজ্যোতি বর্মণ আসতেন। ইনি সাতটি বিষয়ে এম,এ, পাস করেন। এখান থেকে শ্রী বর্মণের 'কার্ল মার্কস' বইটি প্রকাশিত হয়। এই অনুশীলন সমিতির আড্ডাতেই কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, সোভিয়েত রাশিয়ার বিষয়গুলো এসে পড়ে।" [৪]

যুগবাণী সাহিত্যচক্রের আড্ডাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে শোষণমুক্তি, সমবাদ ও সমাজতন্ত্রের আলোচনাই প্রাধান্য পেত। এভাবেই রণেশ দাশগুপ্ত সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হন।

কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই,এসসি, পাস (১৯৩১) করলে তাঁর পিতা তাঁকে রাজনীতি প্রভাবমুক্ত রাখার জন্যে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজিতে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। এ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি জেঠামশাই সত্যানন্দ দাশের 'সর্বানন্দ ভবন'-এ থাকতেন। সেখানে তিনি অনেক বিপ্লবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পান। এ সময়ে বরিশালে প্রথম মার্কসীয় গ্রুপ তৈরি হয়। এ গ্রুপ থেকেই 'জাগরণী' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের হত। পরবর্তীকালে 'জাগরণী গোষ্ঠী' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠিত হয় এবং রণেশ দাশগুপ্ত এ গ্রুপের প্রধান হয়ে ওঠেন। 'জাগরণী' প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় :

"হিমাংশুর মারফত কলেজের আরো কয়েকটি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। যেমন মতি মৌলিক, অমৃত নাগ, সত্য সেন, প্রমথ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ চ্যাটার্জী এবং সেই সূত্রেই শান্তিসুধা ঘোষ ও মণিকুন্তলা সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। এদের সহায়তায় প্রথম বরিশালে মার্কসীয় গ্রুপ তৈরী হয়। এই গ্রুপের তরফ থেকেই একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করা হয়। পত্রিকার নাম ছিল 'জাগরণী'। এই পত্রিকায় যারা লিখতেন তাঁদের মধ্যে শান্তিসুধা ঘোষ ও মণিকুন্তলা সেন ছিলেন। ওরা তখন ছাত্রী। 'জাগরণী' পত্রিকায় যারা লিখে সাহায্য করতেন তারা ছিলেন আমার দুই বোন সুচরিতা ও কমলা।" [৫]

---

৪. রণেশ দাশগুপ্ত, কখনো চম্পা কখনো অতসী, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৩৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

'জাগরণী গোষ্ঠী' তথা এ রাজনৈতিক গ্রুপটির ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং এক সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বরিশাল জেলা শাখায় রূপান্তরিত হয়।

রণেশ দাশগুপ্তের পিতা ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পঙ্গু হন এবং চাকরি হতে অবসর গ্রহণ (১৯৩৪) করেন। গ্রামের বাড়ি পদ্মার ভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তাই তাঁদের পরিবার ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে নতুন বাসা ভাড়া নেয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে রণেশ দাশগুপ্তও পড়া শেষ না করে ঢাকায় চলে আসেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে :

> "বাবার খুব ইচ্ছে ছিল পদ্মাপারের গাউড়পাড়ার আদি গ্রামে পিতৃপুরুষের ভিটেয় জীবনের শেষ সময়টুকু কাটিয়ে দেয়ার। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। পদ্মার প্রচণ্ড ভাঙনের কবলে আমাদের ভিটের অনেকাংশ জলের তলায় হারিয়ে যায়। যার ফলে ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে বাধ্য হই। --- লক্ষ্মীবাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করলাম। ছয়টি কামরাযুক্ত দোতালা বাড়িটির মাসিক ভাড়া ছিল ১৬ টাকা।--- আমাদের সাত বোনের মধ্যে বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায় এবং দুই বোন মারা যায়। বাকি চার বোন, চার ভাই ও বাবা-মাকে নিয়ে গড়ে উঠলো আমাদের নতুন সংসার।" [৬]

রণেশ দাশগুপ্তের পিতার পেনশনের টাকাই ছিল সংসার চলার একমাত্র অবলম্বন। তাঁর জীবনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল সাংবাদিক হওয়ার। একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে কাজ করার জন্যে তিনি ১৯৩৪ সালে কলকাতা যান। কিন্তু সাংবাদিকতায় যোগদান করতে না পেরে ঢাকায় ফিরে আসেন।

তিনি ১৯৩৮ সালে 'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরি নেন এবং পাশাপাশি ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি লিখেছেন :

> "আমার বেশ মনে পড়ে যে গোপাল বসাকের নির্দেশে শ্রমিক ইউনিয়ন নতুন করে শুরু করার জন্য 'ঢাকেশ্বরী কটন্ মিলে' শ্রমিকদের ব্যারাকে একটি লিফ্লেট বিলি করা হয়। লিফ্লেটে রচনার মধ্য দিয়ে আমার শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম হাতে খড়ি।--- ঢাকা শহরে শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি গড়ে ওঠে।" [৭]

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় শ্রমিকদের আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টিকে জনসম্মুখে জোরালোভাবে উপস্থাপিত করে।

পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হলে সংসারের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এ সময়ে রণেশ দাশগুপ্ত ৫০ টাকা বেতনে একটি ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ১৯৪০ সালে কয়েকজন লেখক ও সমমনার সঙ্গে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে তোলেন। প্রগতির লেখকেরা সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সমভাবে অংশ নিতেন। প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে 'ক্রান্তি' ও 'প্রতিরোধ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৪০-৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরকেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলতে থাকে। প্রগতির লেখকেরা এ দাঙ্গা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' উপন্যাসের অন্যতম বাস্তব চরিত্র রণেশ দাশগুপ্ত। রণেশ দাশগুপ্তের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেলিনা হোসেন লিখেছেন :

> "১৯৪২ সালে মার্কসিস্ট কথাসাহিত্যিক, রাজনৈতিক কর্মী সোমেন চন্দ ঢাকার রাজপথে নিহত হন ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের হাতে। সোমেন চন্দ একটি সভায় যোগদান করার জন্য মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নানা কারণে চল্লিশের দশক আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, তেভাগা আন্দোলন, প্রগতি লেখক সংঘ, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মানুষের প্রবল ঝোঁক ইত্যাদির পটভূমিতে একটি উপন্যাস লেখার চিন্তা করছিলাম। নায়ক হবে সোমেন চন্দ এবং উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র থাকবে রণেশ দাশগুপ্ত। তাই আছে- প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তিনি আমার কাছে অনুপ্রেরণার এবং দৃষ্টান্তের মানুষ। মার্কসবাদী সাহিত্যে আমার যে ঝোঁক ছিলো তাতে তিনি গভীরতা দিয়েছেন। চেষ্টা করেছেন যেন আমরা এই ধারাটিকে বহাল রাখতে পারি।"[৮]

রণেশ দাশগুপ্ত শুধুমাত্র একজন সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদই ছিলেন না একজন সফল সমাজকর্মীও বটে। সমাজ-মানসে চেতনা জাগ্রত করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত।

---

৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ, প্রাগুক্ত (সেলিনা হোসেন রচিত 'মরণ সাগর পারে তুমি যে অমর') ; পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্তের জীবনাচরণ কর্মপদ্ধতি ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে মফিদুল হক লিখেছেন :

> "রণেশ দাশগুপ্তের আলাদা ব্যক্তিত্ব, আলাদা জীবনদৃষ্টি ও আলাদা সাহিত্যচিন্তা বোঝার জন্য অতি অবশ্যই একটি আলাদা মাপকাঠি আমাদের প্রয়োজন হবে। তিনি ছিলেন ত্যাগী পুরুষ, অথচ তাঁর জীবনাচারে এমন এক সহজিয়া ভাব ছিল যে, কখনোই মনে হতো না তিনি আত্মত্যাগের সাধনায় ব্রতী রয়েছেন। সবরকম বাহুল্য বিসর্জন দিয়ে যে সরল জীবন যাপন পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন সেটা এমন স্বাভাবিকভাবে প্রতিপালন করতেন যে এর বাইরে তাঁর আর কোন ভাবমূর্তি কল্পনা করা যেত না। তাঁতি-বাজারের বাসার দোতলার যে ঘুপচি ঘরে তিনি থাকতেন তাতে একটা সস্তা তক্তপোশ ছাড়া আর কোনো আসবাব ছিল না। চৌকিতে ছড়ানো থাকতো বই ও পত্রপত্রিকা। কুলুঙ্গিতেও গাদা হয়ে থাকতো বই, অথচ পড়া বা লেখার জন্য কোন টেবিল-চেয়ার তাঁর ছিল না। চৌকিতে কিংবা মেঝেতে বসে উপুড় হয়ে তিনি লিখতেন, পড়তেনও অনেকটা সেভাবেই, আর কী অসাধারণ ব্যাপ্তিই না ছিল এই পঠন-পাঠনের। রুশ সাহিত্য তাঁর ছিল বিশেষ প্রিয়, কিন্তু ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও মার্কিন সাহিত্যের পাঠও তিনি নিয়েছিলেন নিবিড়ভাবে। বহয়ের সংগ্রহ বলে তার বিশেষ কিছু ছিল না, অথচ বইয়ের খবর রাখতেন কতই না। আর সেসব বই কীভাবে কীভাবে যেন যোগাড়ও হয়ে যেত।"[৯]

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি সমাজের মেহনতি মানুষের স্বপ্নকে বিসর্জন দেন নি। মেহনতি মানুষের জীবন যাপনের ধরণ বদলাতে তিনি আজীবন সংগ্রাম ও রাজনীতি করে গেছেন।

ঢাকায় প্রথম (১৯৪০) কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার সময় যারা এর নেতৃত্বে ছিলেন, রণেশ দাশগুপ্ত তাঁদের একজন। এ পার্টির সদস্যরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও কিছু করতে পারেনি। তিনি লিখেছেন :

> "১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর যে প্রশ্ন সব থেকে বড় আকারে দেখা দিল সেটি হলো অপসন। সরকারি কর্মচারিরা দলে দলে অপসন নিতে থাকলো। তারা হিন্দুস্থানে থাকবে না পাকিস্তানে থাকবে এ ব্যাপারে অপসন দেয়া শুরু হলো। আমরা কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে অনেক চেষ্টা করলাম। বার লাইব্রেরিতে বসে মিটিং পর্যন্ত, কিন্তু কিছুতেই রোধ করতে পারলাম না।"[১০]

---

৯. প্রাগুক্ত (মফিদুল হক রচিত 'রূপবিচারী ও রসসঞ্চারী, ত্যাগব্রতী ও জ্ঞানব্রতী রণেশ দাশগুপ্ত') ; পৃ. ১৪৬
১০. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৬ ও ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরমে উঠলে পূর্ব পাকিস্তানের বহু লোক এদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যেতে থাকে। ছোট বোনের বিয়ে দেয়ার জন্যে রণেশ দাশগুপ্ত সপরিবারে কলকাতা গমন ও প্রত্যাগমন করেন এবং ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রচারণা করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করা হয়। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান- এর লেখা থেকে জানা যায় :

> "একটানা প্রায় আট বছর জেল খেটে রণেশদা যখন বেরিয়ে এলেন ১৯৫৬ সালে, তখন তাঁকে প্রথম দেখি। পরিচয় বেশি দূর গড়াবার আগেই আইউব খানের সামরিক শাসনামলে আবার তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তবে এবারে বেশিদিনের জন্যে নয় ; পরে আরও একবার কারাবন্দি হন।" [১১]

কারাগারে অবস্থান কালে তাঁকে ঢাকা, যশোর ও রাজশাহীর বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ইতঃমধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার কারণে তাঁদের পরিবার দেশ ত্যাগ করে (১৯৫০) কলকাতা আশ্রয় নেয়। যশোর জেলে থাকাকালে তিনি সহ-বন্দীদেরকে রাজনীতির পাশাপাশি ইংরেজি, মার্কিন, জার্মান ও ফরাসি সাহিত্য বিষয়ে বক্তব্য দিতেন এবং নিজে উর্দুভাষা শিখতেন। তাঁকে যশোর থেকে রাজশাহী কারাগারে বদলি (১৯৫২) করা হয়। সেখানেও তাঁর ভাষা ও সাহিত্য চর্চা থেমে থাকে নি। জেলখানায় বসেও তিনি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতে ভুলেন নি। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আমিনের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় :

> "ঠিক পাঁচটায় আমাদের লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। তখন শুরু হতো নানা রকমের রাজনৈতিক আলোচনা, ক্লাস, বিতর্ক, বইপড়া ও পর্যালোচনা করা এবং নানা ভাষা শেখানো। উর্দু জানা আমরা ক'জন ছিলাম তাঁদের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত, আমি আরও দু'জন, আমরা বসতাম। রণেশ দাশগুপ্ত বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নাম করেছিলেন। এটা সবাই জানেন। কিন্তু উর্দু সাহিত্য পড়ে তার বিশ্লেষণ করেও তিনি অনেক কিছু লিখেছেন। তার কিছুটা আমি জানি। কিন্তু সবটা পড়ার সুযোগ আমারও হয়নি। আমার কাছ থেকে বিশেষ করে উনি যেটা জানতে চাইতেন, সেটা হলো ফয়েজ ও ইকবালের সঙ্কলন পড়তে গিয়ে যেসব উর্দু শব্দের মানে উনি বুঝতে পারতেন না, সেটা একটা খাতায় নোট করে নিতেন। এবং আমার সঙ্গে বসে সেই শব্দগুলির মানে বাংলা বা ইংরেজিতে উনি লিখে নিতেন।"[১২]

এ থেকে বোঝা যায়, রণেশ দাশগুপ্ত বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এবং জ্ঞান-চর্চার জন্যে তাঁর কোন আলাদা পরিবেশের প্রয়োজন হয় না।

---

১১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ, প্রাগুক্ত (আনিসুজ্জামান রচিত প্রবন্ধ 'রণেশ দাশগুপ্ত'); পৃ. ৬৪

১২. প্রাগুক্ত, (মহম্মদ আমিন রচিত নিবন্ধ 'রণেশদার সঙ্গে দেখা রাজশাহী জেলে') ; পৃ. ১৫২ ও ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে রাজশাহী থেকে ঢাকা জেলে বদলি (১৯৫৩) করা হলে সেখানে এসেও তিনি সহ-বন্দীদেরকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। এই জেলেই রণেশ দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটক রচনা করেন এবং তা জেলখানাতেই প্রথম মঞ্চায়ন হয়।

তৎকালীন সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা (১৯৫৪) করলে জেল থেকে বের হয়ে (১৯৫৫) রণেশ দাশগুপ্তকে 'রেজা' ছদ্মনামে এক উর্দুভাষী পরিবারে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। এ সময়ে তিনি মাও সে-তুং -এর 'শত ফুল ফুটতে দাও' এর অনুবাদ এবং কার্ল মার্কসের জীবনী রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি শাঁখারিবাজার, তাঁতিবাজার ও ইসলামপুর এলাকা থেকে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড কমিশনার (১৯৫৭) নির্বাচিত হন। 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগের জনৈক কর্মীর অসুস্থতার সুবাদে রণেশ দাশগুপ্ত 'সংবাদ'-এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন (১৯৫৮)। এ পত্রিকায় কর্মরত অবস্থায় তিনি সম্পাদকীয় ও 'মনে মনে' নামে কলামে লিখতেন। এ প্রসঙ্গে শুভ রহমানের স্মৃতিচারণমূলক লেখা থেকে জানা যায় :

> "সেখানে সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব ছাড়াও 'মনে মনে' নামে নিয়মিত একটি 'মনের মতো' কলাম লেখার দায়িত্বও তিনি পান। 'মধুব্রত' নামে লিখতেন সে-কলাম। তখন সংবাদ ছেড়ে যাওয়া সৈয়দ নূরুদ্দীনের কলাম ছিল সেটি। এই কলামে রণেশ দাশগুপ্ত একাধারে তাঁর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মেধা ও মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য নিবেদিত জীবনাদর্শের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর সে-কলামের নির্বাচিত কিছু লেখা নিয়ে পরে প্রকাশিত হয়েছে 'সেদিন সকালে ঢাকায়' গ্রন্থটি।"[১৩]

---

১৩. প্রাগুক্ত, (শুভ রহমান রচিত প্রবন্ধ 'চিরঞ্জীব রণেশ দাশগুপ্ত : তাঁর অমর আহ্বান') : পৃ. ১৭১ ও ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক হিসাবে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। যে নীতি ও আদর্শ তিনি লালন করতেন সেখানে ছিল দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সমাজ-সচেতনতা। এ প্রসঙ্গে আবদুল হালিম লিখেছেন :

> "তিনি তখন সংবাদ-এ সহ-সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এটা তাঁর কাছে চাকরি মাত্র ছিল না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি সংবাদ অফিসে বসে কাজ করতেন। কাজ বলতে সম্পাদকীয় লেখাতো আছেই, তাছাড়া সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের খবর, বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির খবর, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবিকাশমান সমাজের কথা যাতে পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে ছাপা হয় সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। এসব কাজ করার জন্যই তিনি প্রতিদিন দশ-বার ঘণ্টা সংবাদ অফিসে উপস্থিত থাকতেন।"[১৪]

দেশ সমাজ ও জাতীয় স্বার্থে রণেশ দাশগুপ্ত কাজ করে যেতেন নিরলসভাবে। সমাজ নিয়ে ভাবনার বিষয়টি তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। এসময়ে তিনি তাঁতিবাজার যে ঘরটিতে থাকতেন তাঁর বর্ণনা মতিউর রহমান এভাবে দিয়েছেন :

> "ষাট এবং সত্তর দশকে রণেশদা তাঁতিবাজারে হরিলাল বসাকের যে বিখ্যাত ঘরে থাকতেন- তিনিই বলেছেন, রণেশদা রসিকতা করে বলতেন, 'যে ঘর থেকে পা বেরিয়ে যেতো'- সেখানে বহুবার গিয়েছি। আসলে, মাথা নিচু করে কোন রকমে ঘরে ঢুকে মাটিতে তোশকপাতা বিছানায় বসে পড়তে হতো, দু'পা সোজা করে বসা যেতো না। আর, ঐ বিছানার চারপাশে বই, খাতা, কতো কাগজ, পত্রিকা ইত্যাদি। এর মধ্যেই বিশ্রাম, ঘুম আর লেখাপড়া; কী বিস্ময়! আর, সেখানে থেকেই কত কিছুনা তিনি লিখেছেন- যা আজও আমাদের পথ আলোকিত করে চলেছে, সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেছে।"[১৫]

দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও শত প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি থেমে থাকেন নি। তিনি তাঁর স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে গেছেন অবিরাম গতিতে।

---

১৪. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত (আবদুল হালিম রচিত 'মানবতাবাদী রণেশ দাশগুপ্ত') ; পৃ. ৬৭

১৫. প্রাগুক্ত (মতিউর রহমান রচিত 'আমি অন্তর্যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চলেছি') ; পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক অধ্যয়ন করে র‍্যালফ ফক্স ও ক্রিস্টোফার কডওয়েলের তত্ত্বালোকে বাংলা, চিনা, সোভিয়েত, আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাসকে মার্কসীয় চেতনায় বিমিশ্রণ করে রচনা করেন 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯) গ্রন্থটি। তিনি হেন্‌রি এলেগ এর "The Question" এর অনুবাদ করেন (১৯৬১) 'জিজ্ঞাসা' নামে। ১৯৬২ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং ১৯৬৩ সালে মুক্তি পেয়ে পুনরায় 'সংবাদ'-এ যোগদান করেন। পরে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯৬৫ সালে আবার গ্রেফতার হন। বাঙালির উপর পাকিস্তান সরকারের দুঃশাসন সত্ত্বেও এ দেশের সাহিত্য- সংস্কৃতি থেমে থাকে নি। কারাগারে বন্দীদশাও রণেশ দাশগুপ্তের জীবন চেতনাকে রুদ্ধ রাখতে পারে নি। এ সময়ে (১৯৬৬) রণেশ দাশগুপ্তের 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে তিনি মুক্ত হন এবং ১৯৬৯-এ তাঁর অনূদিত 'ফয়েজ আহম্মদ ফয়েজের কবিতা' প্রকাশিত হয়। জনগণের শিক্ষা হিসেবে সাহিত্য-চারুকলা-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' (১৯৭০) এবং একই বছর ল্যাটিন আমেরিকার মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারা-র জীবনের পটভূমি নিয়ে রচিত 'ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম' প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫-এর মাঝামাঝি 'সংবাদ' বন্ধ হয়ে গেলে রণেশ দাশগুপ্ত সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে যান। সন্তোষ গুপ্ত রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "১৯৭৫ সালের মধ্য-আগস্টের পর বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা এবং সাহিত্যিক কলকাতায় চলে যান। এঁদের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন অন্যতম। পরে অনেকে দেশে ফিরে এসেছেন। রণেশদা আর ফেরেননি। না ফেরার কারণ সম্পর্কে অনেকে যেসব কথা বলেন তার সবটা সঠিক নয়। অনেকটা অনুমান নির্ভর। এসব বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এটুকু বলা চলে যে, রণেশদা তাঁর স্বাধীন বিচার বুদ্ধিকে কখনও বিসর্জন দেন নি বলে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন কখনও হয়নি।--- রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পার্টির মূল্যায়নের সাথে তিনি একমত হতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল রণেশদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সঠিক ছিল। কিন্তু এজন্য তাঁকে কখনও প্রশংসা করা হয়েছে, এমন কথা শুনিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় তিনি মূল্যায়ন বলে একটি বামপন্থী সাময়িকীতে লিখেছিলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। তারপর ঘটনার পিছু পিছু ছোটে। এ লেখাটা কিছুটা আত্মসমালোচনামূলক। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিকরা তাঁর এ সমালোচনা প্রসন্নভাবে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর দেশে ফেরার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি আগ্রহ দেখায়নি।"[১৬]

রণেশ দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"নিকটজনেরা জানেন, '৭৫-উত্তর দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তাঁর প্রবাস জীবন। বুঝে নিতে চাইব যে, এইটে ঘটনামাত্র নয়। '৭৫-উত্তর শব্দটি গভীর বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এখন আর দুঃখ প্রকাশ করে ফায়দা কী- আপন দেশের অনেক মানুষের মধ্যে একজন মানুষ রণেশ দাশগুপ্ত জীবনের শেষ প্রহরগুলি কাটিয়ে গেলেন প্রায় নিঃসঙ্গ, আরেক দেশের মাটিতে। সে কী অভিমানে ? কিংবা অন্যতর কোনো হেতুতে ?"[১৭]

রণেশ দাশগুপ্তের কলকাতা চলে যাওয়ার বিষয়টিকে সনজীদা খাতুন মূল্যায়ন করেছেন এভাবে:

"আটানব্বইয়ের ১৫ই জানুয়ারি রণেশদার জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার বাংলা আকাদেমিতে আয়োজিত সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম। --- বলেছিলাম রণেশদা- সত্যেনদাদের মতো মহৎপ্রাণদের পার্টি যথাযথ মূল্য দিতে পারেনি বলেই তাঁদের মতের তোয়াক্কা না করে শিল্প-সংস্কৃতির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিল। তাঁদেরকে দেশ ছাড়া করতে বাধ্য করেছিল। এ আঘাত তাঁদের প্রাপ্য ছিল না। তাঁদের আজীবন ত্যাগ পার্টির কাছে মূল্য পায়নি, স্বীকৃতি পায়নি। বলতে বলতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। --- সেদিন মঞ্চে কেউ কেউ বক্তৃতা করে বলেছিল, রণেশদা নাকি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদ স্বরূপ বাংলাদেশ ছেড়ে যান। আমি একথার অসত্য নির্দেশ করে বলেছিলাম যে, পার্টির কাছ থেকে আঘাত পেয়েই তিনি দেশ ছেড়েছেন।"[১৮]

---

১৬. প্রাগুক্ত (সন্তোষ গুপ্ত রচিত 'যে জীবন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে রাঙানো') ; পৃ. ১৭৭

১৭. প্রাগুক্ত (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম রচিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'); পৃ. ১৫৫

১৮. প্রাগুক্ত (সনজীদা খাতুন রচিত 'আজি দুর্দিনে ফিরানু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে'); পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আসলে রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। স্বীয় বিচার-বুদ্ধিকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন লাভ-লোকসান হিসেব করেন নি। কলকাতায় কোথায় এবং কেমন পরিবেশে রণেশ দাশগুপ্ত কালযাপন করতেন সে বিষয়ে জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বর্ণনা তুলে ধরা হলো :

> "কলকাতার যে-অংশটা সাবেকি পুব, সেখানে একটা আধুনিক রাস্তার নাম এন্টালী সিআইটি রোড। তোলা নাম সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ। এখন আর ততো আধুনিক নেই রাস্তাটা, বেশ পুরোনো এবং সেকেলে হয়ে গেছে। সেখানে পদ্মপুকুরে, ছোট্ট একটা মসজিদে গরীব মুসলমানেরা, ও-পাড়ারই বাসিন্দা তাঁরা, প্রায় সবাই উর্দুভাষী, নামাজ পড়েন। মসজিদটার ঠিক গায়ে পি-৪৩ নম্বর বাড়ি। সে বাড়িতেই থাকতেন, দীর্ঘদিন ছিলেন, রণেশ দাশগুপ্ত। ... পি-৪৩ সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ থেকে কালান্তর উঠে গেলে পার্টি সেখানে মার্ক্সবাদ-চর্চার কেন্দ্র 'লেলিন স্কুল' গড়ে তোলেন। --- যেমন কালান্তরে তেমনি লেনিন স্কুল কিংবা পরিচয়ে নানা অনুষ্ঠানে নিয়মিতই হাজির থাকতেন রণেশদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনম্র ভঙ্গিতে নীরব শ্রোতা হয়েই থাকতেন তিনি।"[১৯]

রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে ড. সৌমিত্র শেখর বলেছেন :

> "রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার উত্তরে আর রণেশদা থাকতেন ঠিক মধ্য কলকাতায়। ফলে প্রথমদিকে আমার বাসস্থান, বিশ্ববিদ্যালয় ও রণেশদা'র অবস্থানের যোগাযোগ রক্ষাও বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো বলে বিকেলে চলে যেতাম তাঁর সুন্দরীমোহন এভিনিউর লেনিন স্কুলে। সপ্তাহে দু'দিনতো অবশ্যই। বিটি রোড সিআইটি থেকে ২৩৪ নম্বর বাসে উঠে নামতাম মৌলালি বাসস্টপে, সেখান থেকে হেঁটে পদ্মপুকুর পর্যন্ত। সেটাই সুন্দরীমোহন এভিনিউ। রণেশদা থাকতেন 'লেনিন স্কুল' নামের একটি ভাঙা একতলা আস্তানায়। একটি ছোট লাল সাইনবোর্ড ছিল সেখানে। জিজ্ঞেস করে জেনেছি ওটা একসময় সিপিআই-এর পাঠকেন্দ্র ছিল। একটি লাইব্রেরি ছিল ওখানে এবং পার্টির স্টাডি সার্কেল ওখানেই বসত। এরপর

---

১৯. প্রাগুক্ত (জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রণেশ দাশগুপ্ত: রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ') ; পৃ. ৯৫ ও ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিক ও দৈনিক কালান্তরের কাজও কিছুদিন হয়েছে এখানে। তারপর নানা কারণে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। একজন কেয়ারটেকার থাকতো সেখানে। রণেশদা ঠাঁই পান তার পাশে। অসম্ভব অন্ধকার আর অস্বাস্থ্যকর একটি পরিবেশে দিনের পর দিন থাকতে হয়েছে তাঁকে। একটা সুবিধা ছিল- রান্না করতে হতো না নিজ হাতে। ওই কেয়ারটেকারের চুলোতেই তাঁর চাল উঠত। তা না হলে বাকি সব কাজই নিজ হাতে করতেন ওই অশীতিপর বৃদ্ধ রণেশ দাশগুপ্ত। শখ করে নয়- করতে বাধ্য হতেন। আর পড়ে থাকতেন অন্ধকার ঘরে নির্জীব- একা একা।"[২০]

কলকাতার লেনিন স্কুলে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের হেতু উদ্‌ঘাটনে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন :

"শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের অল্প কিছুকাল পরেই রণেশ দাশগুপ্ত এপার বাংলায় চলে আসেন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় বাইশ বছর নানা দুরবস্থার মধ্যে বসবাস করলেও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব তিনি ত্যাগ করেননি। বাংলাদেশের প্রগতিমনস্ক বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও কবি-সম্প্রদায় এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন এবং তাঁর দর্শনলাভে বার বার আপ্লুত হয়েছেন। লেনিন স্কুলের পুরাতন ভাঙা দালানের প্রায় অন্ধকার ঘর ছেড়ে অন্য কোন আরামপ্রদ আশ্রয়ে কখনোই যেতে রাজি হননি, কেননা লেনিন স্কুলে এসেই সারা বছর বাংলাদেশ থেকে আগত দর্শনপ্রার্থী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, তাঁর স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন।"[২১]

এ লেনিন স্কুলে থাকাটাই রণেশ দাশগুপ্ত সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে করতেন। তিনি এখানে অবস্থানকালে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সময়ে তিনি সাহিত্যের চিন্তা, সৃষ্টি, কাজ, সমস্যা এবং উদারদৃষ্টি সৌন্দর্য ও মানবমুক্তির বাণীকে স্থান দিলেন 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ' (১৯৮৬)

---

২০. ড. সৌমিত্র শেখর, সিভিল সোসাইটি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২০০৪, মনন প্রকাশ, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ; পৃ. ১৪৪

২১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচিত 'রণেশ দাশগুপ্ত : এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব') ; পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ-সংকলনে। মুক্তিযুদ্ধ, শ্রেণীচেতনা ও সংগ্রামের অনুষঙ্গ বিবেচনাধর্মী 'মুক্তিধারা' (১৯৮৯) তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ। রণেশ দাশগুপ্ত আশাবাদী মানুষ। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেও তিনি একটুও বিচলিত হন নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যতীন সরকার লিখেছেন :

> "বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে উল্টোরথের টান দেখে বাঘা বাঘা সমাজতন্ত্রীদের অনেকেই সীমাহীন চিত্তবৈকল্যে আক্রান্ত হলেন, অনেকেই বিশ্বাসের দিক থেকে একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়লেন। অনেকেই সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ তথা মার্কসবাদের মতো একটি 'বোগাস' (!) ধারণা নিয়ে এতোদিন মোহাচ্ছন্ন ছিলেন বলে এবার শরমে মরে গেলেন। অনেকে 'থ্রুক্কু' বলে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে আশ্রয় নিলেন, অনেকে হতাশার অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন। কিন্তু, কী আশ্চর্য, রণেশ দাশগুপ্তকে এ-রকম কিছুই করতে হলো না। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের মুখে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের প্রতি তাঁর আস্থা বরং আরো দৃঢ় হয়ে উঠলো, হতাশার বদলে তাঁর আশাবাদ আরো অনেক গভীরে শিকড় চারিয়ে দিলো, 'সাম্যবাদী উত্থানপ্রত্যাশা' তাঁর বার্ধক্য-জীর্ণ শরীরে যৌবনের নতুন জোয়ার নিয়ে এলো।"[২২]

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় রণেশ দাশগুপ্তের মনের আস্থা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি মনেপ্রাণে সাম্যবাদের উত্থান কামনা করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি সমাজতন্ত্রকে ভুলতে পারেন নি। শেষ বয়সে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না বিধায় কলকাতার বামপন্থী সাংস্কৃতিক-কর্মী রতন বসু মজুমদার তাঁকে বি.টি. রোডের নিজস্ব আবাসে নিয়ে যান। এ পরিবারের আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেন। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাকে কলকাতার পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থার অবনতি রোধকল্পে কর্তব্যরত ডাক্তার ডি.এন. রায় ও মাইতির তত্ত্বাবধানে পেসমেকার লাগানো হয়। ৪ঠা নভেম্বর তাঁকে জোর করে খাওয়ানোর সময় শ্বাসনালীতে খাবার ঢুকে যায়। দুপুর বারটার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ লিখেছেন :

> "পরদিন সকালে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সি. পি. আই-এর রাজ্য দপ্তর ভূপেশ ভবনে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুসহ অগণিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। দুপুরে বাংলাদেশ সীমান্তের উদ্দেশে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য এর আগের দিনই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার, ভারতের জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বি. এস. এফ. এর তত্ত্বাবধানে বিকেল ৪ টায় বেনাপোল সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে লাশ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। --- তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়

২২. প্রাগুক্ত (যতীন সরকার রচিত প্রবন্ধ 'রণেশ-চরিতামৃত : স্মৃতির স্বর্ণপাত্রে') ; পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

> যশোরের উদীচী কার্যালয়ে। সেখান থেকে শেষ রাতে তা ঢাকায় পৌঁছে। ৬ই নভেম্বর রণেশ দাশগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রক্ষিত তাঁর মরদেহে। সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বিকেলে শ্যামপুর শ্মশানঘাটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা করা হয়। বাংলার মাটিতে চিরতরে মিশে যায় তাঁর দেহভস্ম।" [২৩]

আজীবন সংগ্রামী, মহান মনীষী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রণেশ দাশগুপ্তের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এভাবেই একটি মহাজীবনের যবনিকা পতন ঘটে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্যু অবধি প্রায় ২২ বছর তিনি ভারতের মাটিতে থাকলেও তিনি ভারত সরকারের দেয়া নাগরিকতা বা মাসিক সম্মানী ভাতা, কোনটাই গ্রহণ করেন নি। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করলেও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন এদেশের ক্ষেত্রজপুত্র। তাই মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ কলকাতা থেকে ঢাকায় এনে দাহ করা হয়।

সমকাল

কোন লেখকই সমকালীন প্রসঙ্গকে অতিক্রম করতে পারেন না। সমকালীন ঘটনা প্রবাহ তাঁকে প্রভাবিত করবেই। রণেশ দাশগুপ্তও সমকালীন আবহকে সামনে রেখেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশকে লক্ষ্য করে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেছেন,

> "সতের'র রুশ বিপ্লব থেকে নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েতের বিপর্যয়- বিশ্বের বিপ্লবী ইতিহাসের এই চড়াই-উতরাই'র মধ্যে থাকা একজন বিপ্লবী ঋষির নাম রণেশ দাশগুপ্ত।" [২৪]

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। শৈশব থেকেই তিনি কিরূপ পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠেছেন; তাঁর সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিবেশই বা কেমন ছিল তার একটা সঠিক চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

---

২৩. প্রাগুক্ত (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রচিত 'রণেশ দাশগুপ্ত : জীবনকথা') ; পৃ. ৫৪ ও ৫৫
২৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালে। বিশের দশকে বাংলাদেশে জোতদার, তালুকদার ও হিন্দু জমিদারদের সহায়তায় মুসলিম উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এ সময়েই আবির্ভাব ঘটে কৃষক-বন্ধু, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ এ, কে, ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) মতো নেতার। হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের স্মারক চুক্তি সাধিত হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে। এ-সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে (১৯১৭) রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বশক্তির পতন ঘটে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) প্রতিবাদে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন আরও ঘনীভূত হয় এবং খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন আরও তীব্রতর আকার ধারণ করে। এই সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) এর মুখপত্র 'শিখা'-র মাধ্যমে এ সময়ে গড়ে ওঠে 'বুদ্ধির মুক্তি'র আন্দোলন। 'শিখা' পত্রিকা সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের লেখা থেকে জানা যায় :

> "শিখা পত্রিকায় ছাপানো হতো 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' রেনেসাঁর সমধর্মী চেতনায় উদ্দীপ্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), অধ্যাপক শামসুল হুদা, মোখতার আহমদ সিদ্দিকী, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। এই গতিশীল আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' Emancipation of intellect"[25]

---

২৫. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, ১৯৬৩, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের সূত্রধরে বাংলাদেশের রাজনীতি অঙ্গনে একাধিকবার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (১৯২৬) ফলে হিন্দু-মুসলমানদের সম্প্রীতির সম্ভাবনা কমতে থাকে। বিভিন্ন সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপর আকস্মিক হামলা তাদের জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিসহ। একটা অস্থির পরিবেশের মধ্যে তাদের জীবন-যাপন করতে হতো। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি-অঙ্গনে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক উত্তপ্ত পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে ওয়াহিদুল হক লিখেছেন :

> "আমাদের উন্মেষকালে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ছিল প্রধান সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা, সবকিছুকে ছেয়ে থাকত তা। এতটাই যে, অধিকাংশ মানুষের মনের ভিতর ঢুকে শিকড় গজিয়েছিল তা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। তার মধ্যে অনুসরণ করবার, প্রভাব নেবার মতো আদর্শ মানুষ কোথায় পাব ?"[২৬]

রুশ-বিপ্লবের তত্ত্বাবেগে বাংলার প্রগতিশীল সমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শুরু থেকেই কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল। মার্কসীয় তত্ত্ব ও সাহিত্য তিরিশের দশকের শেষের দিকে বাংলার শিক্ষিত তরুণ-সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৩৬) গঠন এ চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। ১৯৩৯ সালে ঢাকায় প্রথম গঠিত হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এ প্রসঙ্গে ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের একটি উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো :

> "নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' স্থাপনের অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠনের শাখা গঠিত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর ১৯৩৯ সালে, ঢাকায় স্থাপিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা।"[২৭]

---

২৬. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত (ওয়াহিদুল হক রচিত নিবন্ধ 'আদর্শ মানুষের খোঁজে') ; পৃ. ৭৩

২৭. প্রাগুক্ত (বিশ্বজিৎ ঘোষ রচিত 'ঢাকায় প্রগতি লেখক আন্দোলন ও রণেশ দাশগুপ্ত'); পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতির লেখকেরা সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সমভাবে অংশ নিতেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায় শুরু থেকেই এ সংঘের বিরোধিতা করেছে। প্রগতির লেখকদের মধ্যে শামসুর রহমান খান, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অরবিন্দ সেন, আমিনুল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান, কল্যাণ দাশগুপ্ত, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সরদার ফজলুল করিম, সানাউল হক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সংঘই এদেশের তরুণ-মানসে প্রগতিশীল জীবন-দৃষ্টি ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। 'প্রগতি লেখক সংঘের' উদ্যোগে 'ক্রান্তি' ও 'প্রতিরোধ' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ১৯৪০- ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরকেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলতে থাকে। সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের বৈরীভাব এত বেশি তীব্র ছিল যে, হত্যার মত জঘন্য কাজ করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। পরবর্তীকালে এ দাঙ্গা শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তা হিন্দু-পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু পাড়ায় মুসলমানদের এই বর্বরোচিত দাঙ্গার কারণে বহু হিন্দুলোক স্বদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমায়। এ সময় রণেশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম (১৯৪০) কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এ পার্টির সদস্যরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও কিছু করতে পারে নি। কমিউনিস্ট-বিরোধীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বার বার রক্তক্ষয়ী সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এ সংঘাতে অনেক কমিউনিস্টকে অকালে জীবন দিতে হয়েছে। রেল-শ্রমিকনেতা সোমেন চন্দ তাঁদের অন্যতম। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের লেখা থেকে জানা যায় :

> "১৯৪১ সালে হিটলারের নাৎসি বাহিনী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হলে পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি 'জনযুদ্ধ'-এর তত্ত্ব ঘোষণা করে এর পক্ষে প্রচার চালায়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এদিকে কমিউনিস্টরা এখানে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পায় ; অন্যদিকে 'সমাজতন্ত্র' সমর্থক ও ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন এমন কয়েকটি দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের রক্তক্ষয়ী বৈরিতার সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিতেই প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক ও রেল-শ্রমিক নেতা সোমেন চন্দর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়।"[২৮]

---

২৮. প্রাগুক্ত (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রচিত 'রণেশ দাশগুপ্ত: জীবনকথা') ; পৃ. ২৮ ও ২৯

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ জ্ঞান চক্রবর্তীর একটি বর্ণনা যুক্ত করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

> "আমাদের এই ফ্যাসিস্টবিরোধী জনযুদ্ধের নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে জাতীয়তাবাদীরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করিতে থাকে। তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা এই নীতি গ্রহণ করিয়া আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করিতেছি এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি। সুযোগ পাইলেই তাহারা আমাদের কমরেডদের ওপর মারাত্মক আক্রমণ চালায়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে প্রদ্যোৎ সরকার নামে জগন্নাথ কলেজের একজন তরুণ ছাত্র- কমরেড দিন-দুপুরে ছোড়ার আঘাতে নিহত হয়। এই বছরেই ৮ই মার্চ আমাদের কমরেডদের উদ্যোগে সূত্রাপুরে একটি ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য রেলওয়ে কলোনী হইতে একজন রেলশ্রমিক তরুণ সাহিত্যিক কমরেড সোমেন চন্দের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে থাকেন। পথে লক্ষ্মীবাজারের নিকট এই শোভাযাত্রাটি ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রুপের কর্মীদের দ্বারা বেলা ৩ টায় আক্রান্ত হয়। সোমেনকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ... এই বামপন্থী জাতীয়তাবাদী কর্মীরা লাঠি তরবারি ভোজালী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুনঃ পুনঃ সম্মেলন স্থান আক্রমণ করে। পার্টি কর্মীদের উপর বামপন্থীদের এই হামলা ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই হামলার ফলে কচি নাগ নামে বার্মা প্রত্যাগত একজন ছাত্র কমরেড ১৯৪৪ সালে ঢাকা শহরে ওয়ারীতে নিহত হন। ইহা ছাড়াও ঢাকা শহরের রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ এবং নারায়ণগঞ্জের অনেকে মারাত্মকভাবে জখম হন।"[২৯]

পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে সরকারি-নির্যাতন, দমননীতি, গ্রেফতার, সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায় এবং বন্দিদেরও মুক্তি দেয়া হয়। এ অবস্থায় পার্টি-ঘেষা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। ঢাকা শহরের সচেতন লেখক, শিল্পী, নাট্যকার প্রগতি লেখক সংঘে যোগ দিতে থাকেন। এভাবে প্রগতি লেখক সংঘের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনচেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

---

২৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮ ও ২৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সমাজ ও রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে টানা ছটি বছর। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে শুরু হয়ে ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরেই শেষ হয়। রক্তচক্ষু দৈত্যের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেশের বাইরে ও ভেতরের জীবন-স্বভাবে ত্বরিত পরিবর্তন ঘটায়। আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়াল মন্বন্তর, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য। মধ্যবিত্ত সংসারে শুরু হয় ভাঙন, অবক্ষয় ও পতন। এ সময়ে গণিকাবৃত্তির আবির্ভাব, কালোবাজারি, মুনাফাখোর প্রভৃতি কারণে বাংলার জনজীবনে শুরু হয় এক দুর্বিসহ যন্ত্রণা।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। এ বিভক্তি ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির বৈষম্যমূলক আচরণ ও ষড়যন্ত্রের ফসল। এ বিভক্তির ফলে পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে চলে গেল। পাকিস্তানি বৃহৎ বেনিয়া গোষ্ঠী অতি দ্রুত পূর্ববাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো। শ্রেণিস্বার্থের প্রয়োজনে এদেশের সামন্তশ্রেণি ও মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। পশ্চিমা বেনিয়া ও দেশীয় সামন্তশোষণে পূর্ববাংলার সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে থাকে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বিরোধী। এ সময়ে নব্যশিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের আবির্ভাবে মধ্যবিত্ত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এক শ্রেণি মুক্তচিন্তা, মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসীয় চেতনায় বিশ্বাসী, আর অন্য শ্রেণি সামন্তবাদপুষ্ট পাকিস্তানি প্রশাসনে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ববাংলার শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসের কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। মার্কসবাদী প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি এর তীব্র বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশে ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সালে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যার করাল গ্রাসে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। পাকিস্তান শাসকচক্রের ভ্রান্ত খাদ্যনীতির ফলে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-জনতা পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি সরকারের গণবিরোধী কার্যক্রমকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন হয়।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ'র ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করেন এদেশের ছাত্রসমাজ। পাকিস্তান সরকারের কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন বৃহত্তর জনজীবনে ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও পাকিস্তানি

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষণশীল শাসকচক্র বাংলা বর্ণমালা, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমেদের লেখা থেকে জানা যায় :

> "১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪) ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" [৩০]

এ ঘোষণায় বাংলার ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রচণ্ড আক্রোশে প্রতিবাদ জানায়। ছাত্র-সমাজের উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দেশব্যাপী ধর্মঘট ডাকা হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ধর্মঘট, মিটিং, মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করে। বাংলার বিক্ষুব্ধ ছাত্র-সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্লোগানমুখর মিছিল করলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রফিকউদ্দিন আহমদ (রফিক), শফিউর রহমান (শফিক), আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, আবুল বরকত এবং কিশোর অহিউল্লাহসহ আরো অনেকে।

পুলিশের এ বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতার ঢল নেমে আসে। '৫২ -এর দাবিকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব না হলেও জনজীবনে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক খাজা নাজিমুদ্দীনের বরখাস্ত ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকেই অনিবার্য করে তোলে। ১৯৫৪ -এর নির্বাচনে প্রগতিশীল দল যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়। এ বিজয় বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রথম গণতন্ত্রের বিজয়।

---

৩০. কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ১৩৭৬, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা ; পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব পড়ে সমকালীন শিল্প-সাহিত্যে। ফলশ্রুতিতে, শিল্পী, সাহিত্যিক ও নেতা-কর্মীদের কারাগারে প্রেরণসহ চক্রান্তের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করা হয়। এতে বাংলার সচেতন জনগোষ্ঠী পাকিস্তানি প্রশাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করেন। রাজনৈতিক সংকট ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও জনজীবনে কিরূপ মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল এ প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খানের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

> "সংগ্রাম রক্তপাত ও উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-১৯৫৭ কাল পর্বে বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক অন্তঃশীলা পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন-প্রত্যাশা এ-পর্যায়ে মধ্যবিত্তমানসের অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে। গণতন্ত্র, মানববাদ ও প্রগতিশীল চেতনার ক্রমপ্রসার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনে গতি সঞ্চারে অনেকাংশে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি প্রশাসন যন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট সামন্তমূল্যবোধ-আক্রান্ত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও নবজাগ্রত সচেতন মধ্যবিত্তের গতিশীল কর্মকাণ্ড বৃহত্তর জনজীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।"[৩১]

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান রণেশ দাশগুপ্ত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে নিয়ত সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সমবাদী সমাজ-ব্যবস্থা।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী-মুসলিম লীগের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে 'আওয়ামী লীগ' নামে মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। মুসলিম-লীগের কর্মীরা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সভায় বারবার হামলা চালায়। ফলে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তান সরকার নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে পার্টির কর্মকাণ্ডে বাধা দান করে। শাসকচক্রের শোষণ ও নিপীড়নে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক কর্মীই কারারুদ্ধ হন, কেউ বা ভারত পাড়ি জমায়, কেউ বা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির

---

৩১. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রযাত্রা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে বিস্তার লাভে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এ পার্টির উপর জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে। এ নির্যাতনে অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে ছদ্মবেশে জীবন-যাপন করতে হয়। এভাবে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মার্কসবাদী সাহিত্যিকদের সাহিত্য-ভাবনা ও শিল্পশরীরের পরিবর্তন ঘটে। দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সকল রাজনৈতিক দল ও কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করা হয়। এতে বাঙালি জাতির মৌলিক অধিকার লুণ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

> "১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার নামে যে গোপন প্রতিবেদন তৈরী করে, তার মধ্যেই বাঙালির স্বাধীন সাংস্কৃতিক সত্তা বিনাশের পাকিস্তানি চক্রান্ত সুস্পষ্ট। বাঙালি-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তারা ভারতীয় ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব শনাক্ত করে এবং পাকিস্তানের ধর্মাদর্শ-অনুযায়ী তাকে পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।" [৩২]

তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ব-বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসের পায়তারা করছিল।

১৯৫৯ সালে 'পাকিস্তান লেখক সংঘ' গঠিত হলে পরবর্তীকালে এ সংঘ মানবতাবাদী প্রগতিশীল সোসিয়ালিস্টদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে, ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট, মিছিল করে। পুলিশের উপর হামলা চালায় এবং গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়; সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পরবর্তীকালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে মিছিল হয়। এ ছাড়াও পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এদেশের রাজনীতি-অঙ্গনে নতুন ইস্যু সৃষ্টি হয়।

---

৩২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ; পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসন বাতিল হয়ে যায় ১৯৬২ সালে। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকারের দমননীতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করার জন্যে প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি করে। এতে পূর্বপাকিস্তানের সাংবাদিকমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে পূর্বপাকিস্তানে আবারও দাঙ্গা শুরু হয়। আবু জাফর শামসুদ্দীনের আত্মস্মৃতি থেকে জানা যায় :

> "এই দাঙ্গার পশ্চাতে ছিল মোনায়েম খাঁর শাসনাধীন পূর্বপাকিস্তান সরকার। সরকারি ইঙ্গিত পেয়ে বিহারীরা দাঙ্গা শুরু করে। কিন্তু দাঙ্গার ভয়বহতার মধ্যেও বাঙালী জনসাধারণ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দাঙ্গা প্রতিরোধ ব্যাপারে বিস্ময়কর ঐক্যের পরিচয় দেয়। বাঙালীর মালিকানাধীন ঢাকার সকল দৈনিক পত্রিকা একযোগে একই দিনে 'বাঙালী রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে অত্যন্ত জোরালো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।" [৩৩]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধকল্পে এক কমিটি গঠিত হয় এবং 'পূর্বপাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে প্রচারপত্র বের করা হয়। এ দাঙ্গা প্রতিরোধের দৃঢ় প্রত্যয়ই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে করে বেগবান। আইউব খানের ১৯৬৫ সালে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া এবং পাক-ভারত যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার রাজনীতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। পূর্ববাংলার প্রতিরক্ষার প্রতি শাসকচক্রের উদাসীনতা জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ সমকালীন ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে 'অল পাকিস্তান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সে'-এ তাঁর ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করে এর ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,

> "আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই প্রকৃতপক্ষে বাঙালির স্বাধীকার আন্দোলনের গতি তীব্রতা লাভ করে।" [৩৪]

---

৩৩. আবু জাফর শামসুদ্দীন, আত্মস্মৃতি (প্রথম খণ্ড), ১৯৮৯, ঢাকা ; পৃ. ৩৮৩

৩৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক), প্রাগুক্ত ; পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ছয় দফা কর্মসূচি এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে পাকিস্তানি শাসকচক্র ভীত হয়ে পড়ে এবং শেখ মুজিবকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। জামিনের অযোগ্য বলে তাঁকে জেল থেকে জেলে স্থানান্তরিত করতে থাকে। ফলে সারা দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয় আওয়ামী লীগের ডাকে। হরতাল চলাকালে সরকারের পুলিশবাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনসহ সমগ্র দেশবাসী পূর্ববাংলার স্বায়ত্বশাসন দাবি করে। পাকিস্তানি শাসকচক্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' সাজায় এবং রাজবন্দীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করে। ফলে বাঙালি জাতি তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে। তৎকালীন শাসকচক্র ১৯৬৮ সালে বাংলা ভাষা, বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের প্রস্তুতি নিলেও প্রতিবাদের মুখে তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এ সময়েও শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ছাত্র-রাজনীতির এক গৌরবময় অধ্যায় ১৯৬৯ সালে এগার দফা দাবি উত্থাপন। 'দাবি দিবস' পালন সমাবেশে পুলিশের নির্যাতন চলে। এর সূত্র ধরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হন। আন্দোলন আরও ভয়াল রূপ ধারণ করে এবং ২৪শে জানুয়ারি ঢাকা শহরে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় কতিপয় নির্ভরশীল গ্রন্থে :

> "সচিবালয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে ঘটনাস্থলে পাঁচজন মৃত্যুবরণ করে। বিক্ষোভকারী জনতা লাশ নিয়ে মিছিল বের করে এবং সরকার সমর্থিত পত্রিকা অফিসসমূহ, জাতীয় পরিষদ সদস্যের বাড়ি এবং নওয়াবপুর রোডে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষীর হোটেলে অগ্নিসংযোগ করে। দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট বিরোধীদলের নেতাদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় এবং ১৮ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সামসুদ্দোহা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হওয়ার সংবাদ ঢাকায় প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য আইন অগ্রাহ্য করে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। সমগ্র রাতব্যাপী ঢাকা শহর স্লোগান ও বুলেটের আওয়াজে প্রকম্পিত হয়। সে রাত্রির নিহতের সংখ্যা সরকার পরিচালিত পত্রিকা অনুসারে ছিল ৩৯ জন। সরকার গণ-জাগরণের প্রচন্ডতায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তিদান করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে ঢাকার ইতিহাসে বৃহত্তম জনসভায় 'সংখ্যাসাম্য নয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে' প্রতিনিধিত্বের দাবি জানিয়ে রেসকোর্সের গণ-সংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দান করেন। গণ-সংবর্ধনায় সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানায়। তাঁরা ঘোষণা করেন ১১ দফা দাবি পূরণের মধ্যেই শহীদদের রক্ত ও নির্যাতিত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতী জনতার দাবি পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ স্বৈরাচারী আইউব সরকারের পদত্যাগ, জনগণের হাতে আশু ক্ষমতা অর্পণ এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করে ১১ দফার ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।" [৩৫]

রাওয়ালপিণ্ডির গোলটেবিলে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্রসমাজের এগার দফা দাবির পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করলে কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় ১৯৬৯ সালের ২৪শে মার্চ আইউব খান বে-আইনীভাবে সামরিক বাহিনীপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৯৭০ সালে এক ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং অধিকার আদায়ের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ -এর সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। কিন্তু মাত্র ৮৮টি আসন প্রাপ্ত পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের আসনে বসতে অস্বীকৃতি জানায়। এ ব্যাপারে একটি মীমাংসায় আসার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাকে শেখ মুজিবুর রহমান সাড়া দিলেও ভুট্টো প্রত্যাখান করে। ভুট্টোর এ ঔদ্ধত্য আচরণ এবং নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা অর্পণে গড়িমসি করার কারণে পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং

"১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐতিহাসিক এই ঘোষণা ছিলো বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা।" [৩৬]

---

৩৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক), প্রাগুক্ত ; পৃ. ৪৩৮

৩৬. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯৯২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ; পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

পাক-প্রশাসনের হীন চক্রান্ত সম্পর্কে পূর্ব বাংলার জনগণ বুঝে ওঠতে পারে নি। পাক- বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে নৃশংস গণহত্যা। পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণ একত্রিত হয়ে বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দেশকে পাক-হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব বাংলার প্রায় প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আস্তে আস্তে গণআন্দোলন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর পূর্ব বাংলা পাক-হানাদারমুক্ত হয়। পাকিস্তানের সমরাধিনায়ক লে: জেনারেল নিয়াজী ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল সমাবেশে ভারত-বাংলাদেশের যৌথবাহিনীর নিকট বাংলাদেশে অবস্থিত সকল পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ-দলিলে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হলো। একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট নেমে আসে। যুদ্ধোত্তর হতাশা, শূন্যতা, ব্যর্থতা ও অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা সমকালীন যুবসমাজকে অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত করে। ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্বতৈলসংকট এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জাতীয় জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানে সংশোধনী এনে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার আইন গৃহীত হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রপতির একক ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে সামরিক বাহিনীদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন এবং ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে মুজিবনগর সরকারের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা- তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান নির্মমভাবে নিহত হন। দেশের ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনীর হাতে। পরে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেণ এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি শহীদ হন। ক্ষমতাবদলের ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেনাবাহিনী প্রধান হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

স্বেচ্ছাচারিতায় জাতীয় অস্তিত্ব অনেকাংশেই লুপ্ত হয়ে যায়। দেশে শুরু হয় অস্থিরতা। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে গণতন্ত্রের আবার বিজয় ঘোষিত হলো। ক্ষমতাদখলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে সম্ভব সব ধরণের কৌশল তাঁরা অবলম্বন করে। সংবিধানের ৮ম সংশোধনী (১৯৮৮) ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম-ঘোষণার ফলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলতে থাকে ধর্মের অপব্যবহার। তারপরও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতির বিস্তার ও বিকাশ আশানুরূপ না হলেও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছে। তবে মৌলবাদী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির পুনরুত্থান বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করেছে। উপরিউক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলাদেশের প্রবহমান শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁর সমকালীন সমাজ-জীবনের শোষণ-নিপীড়ন, ব্যক্তি-সমষ্টির দ্বন্দ্ব, শ্রেণি-দ্বন্দ্ব ও সমাজতান্ত্রিকতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ কমিউনিস্ট। কমিউনিজমের আদর্শকে ধারণ করেই তিনি রাজনীতি অঙ্গনে প্রবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে মার্কসীয় চেতনা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

স্বদেশ রাজনীতির উত্থান-পতনের পাশে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে যে পরিবর্তন ঘটেছে সে-সব বিষয়েও রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন সচেতন। সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর সম্পৃক্ত। রাজনীতির পট পরিবর্তিত হলে সমাজও বদলে যায়। পরিবর্তনশীল সমকালীন সমাজ ও রাজনীতিকে রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধের বিষয় করে তুলেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির চালচিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। এ রাজনীতি যখন যে রং ধারণ করেছে, তখনই তিনি তার স্বরূপ সে প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়। তিনি নিজস্ব বিশ্বাস ও দর্শনের আলোকে সংকট-উত্তরণ করে দেখতে চেয়েছেন সোনালী ভবিষ্যৎ ; শুধু নিজে দেখতে চান নি, দেখাতেও চেয়েছেন সকলকে। তাঁর প্রবন্ধালোচনায় শিল্প-সংস্কৃতিবিষয়ক ভাবনাও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে রণেশ দাশগুপ্তের চিন্তার পরিধির মধ্যে ছিল সবই, মানুষের সঠিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তার একটুকুও কম নয়।

সাংবাদিকতা জীবনে তিনি একাধিক পত্রিকায় কাজ করেছেন। ১৯৭৫ সালে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে দেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিকূল

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ ছেড়ে কলকাতা চলে যান। তাঁর কলকাতা চলে যাওয়া এবং বাংলাদেশে আর ফিরে না আসার বিষয়টিকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে দেখেছেন। তবে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। তিনি প্রবাসে থাকলেও বাংলাদেশের জন্যে তাঁর মনপ্রাণ সদা আকুল থাকত। এ প্রসঙ্গে ড. সৌমিত্র শেখর রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিচরণ করতে গিয়ে লিখেছেন :

> "১৯৭৫ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করলেও নাগরিকত্ব নিলেন না। বাংলাদেশের নাগরিকই হয়ে রইলেন শেষ অবধি। যদি ভারতের নাগরিকত্ব চাইতেন তবে পেতেন। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক ভাতা আছে- আছে বিমান, রেল, স্টিমার ইত্যাদিতে টিকিটের উপর কনসেশন। এছাড়া সম্মানটাও অনেক বেশি। কজনইবা স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবিত ছিলেন ভারতে ঐ সময়? ওদের স্বাধীনতা তো এসেছে ১৯৪৭-এ। রণেশদা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন অনেক বামপন্থী। তিনি বলতেন আমি এমন লক্ষ্মী চাইনা যা গ্রহণ করলে বাংলাদেশের মানুষ আমাকে পর ভাববে।"[৩৭]

তাই জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি কলকাতায় থাকলেও রইলেন বাংলাদেশের মানুষ হয়েই। সেখানেও তাঁর লেখনী থেমে থাকেনি। তিনি সমকালীন ঘটনার আলোকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনায় সমালোচনা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এ সময়ে তাঁর বহু লেখা কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। শুধুমাত্র কলকাতায়ই নয়, এ-সময়ে বাংলাদেশের ঢাকার অনেক পত্রিকায়ও তাঁর অসংখ্য লেখা ছাপানো হয়েছে। তাঁর এ-সব অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলির সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করাও দু:সাধ্য। কলকাতার পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষ করে, দৈনিক ও সাপ্তাহিক কালান্তর, পরিচয়, সাহিত্যচিন্তা, মূল্যায়ন, ঐক্যতান, অর্কিড ও লেখক সমাবেশ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ ছাপানো হয়েছে। এসব পত্র-পত্রিকার বাইরেও তার প্রচুর লেখা ছাপানো হয়েছে। তিনি একাধিক পত্রিকায় কলাম লিখতেন, 'ভারতকথা' তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ভোরের কাগজ', 'দৈনিক সংবাদ' 'সাপ্তাহিক একতা' 'মাসিক মুক্তির দিগন্ত'-সহ আরও অনেক পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। এসব পত্র-পত্রিকায় তিনি সমকালীন ঘটনা-প্রবাহ নিয়েই বেশি লিখতেন।

---

৩৭. ড. সৌমিত্র শেখর, প্রাগুক্ত, (প্রবন্ধ - 'রণেশ দাশগুপ্ত : সফেদ শ্মশ্রুতে যেন বিপ্লবী ঋষি') ; পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মানস

সমাজবাস্তবতা, পারিপার্শ্বিক আবহ ও বিশেষ বিশেষ সময়ের আবর্তে ব্যক্তিমানসে নব নব চেতনার জন্ম নেয়। রণেশ দাশগুপ্তের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতি চর্চা তাঁর জীবনাদর্শ বিকাশে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের ক্রমপর্যায়ে তাঁর সাধনার পরিধি এর মধ্যেই বিস্তৃতি লাভ করে। রণেশ দাশগুপ্তের লেখক-সত্তার বিরাটত্ব ও চেতনার মূল্যায়ন করতে হলে এর উৎস-সন্ধান অত্যাবশ্যক। কোন মানুষই তাঁর সময় ও সমকাল থেকে বিচ্ছিন্ন নন। রণেশ দাশগুপ্তও ছিলেন না। মহৎ মানবসন্তানদের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তাঁর সমকালীন প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ আত্মজীবনে সাঙ্গীকরণের মাধ্যমে নিজের বোধ ও মননের জগৎ সম্প্রসারিত করেন ও জনকল্যাণমুখী সম্মুখ কৃতকর্মে অগ্রবর্তী হন, রণেশ দাশগুপ্তের ক্ষেত্রেও ঘটেছিলো তেমনি। ছেলেবেলা থেকেই সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে পারিবারিক অর্জনসমূহের মিথস্ক্রিয়ায় রণেশ দাশগুপ্তের মানস গড়ে ওঠে। রণেশ দাশগুপ্তের মনোদর্শন অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা এমন একজন মানুষকে পাবো, যিনি প্রাণশক্তি ও আদর্শিক বলে আত্মনিষ্ঠ এবং অনুসরণযোগ্য। তাঁর সম্পর্কে বলা যায় :

> "মানুষের শিল্পকর্ম নিখুঁত হলেও মানুষ নাকি নিখুঁত হয় না। রণেশদা ছিলেন স্ব-অর্জিত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। দৃশ্যত এক সৌম্য, শান্ত শাদামাটা মানুষ। কিন্তু অন্তর্লোকে বিদ্রোহী মনীষী। চিন্তা ও চেতনায় ছিলেন সাম্যবাদের ঐতিহ্যগত ধারণায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং বিশ্বজনীন। কথার প্রতিটি শব্দে ছিল এক মনীষীর সমর্পিত হৃদয়াবেগ। কণ্ঠে দৃঢ় বিশ্বাসের বজ্রনিনাদ। দৃষ্টিতে মর্মভেদী তীক্ষ্ণভাব, কল্পনাশক্তির ক্ষিপ্রবেগ। গতি স্থিত হওয়ার অবকাশ ছিল না। মানুষের মাঝে শ্রেণি বিভাজন, শোষণ তাঁকে অবিরাম তাড়িত করেছে। কথায়, লেখায়, আলোচনায় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। তাঁর সবকিছুই নিবেদিত ছিল মানুষের শোষণমুক্তির আন্দোলনে। এক কথায় নিখুঁত মানুষ।" [৩৮]

---

৩৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত (কবীর আনোয়ার রচিত প্রবন্ধ 'তারুণ্যের নিমজ্জন হয়েছিল রণেশ দাশগুপ্তে') : পৃ. ৭৯ ও ৮০

Dhaka University Institutional Repository

কিশোর বয়স হতেই রণেশ দাশগুপ্ত বিচিত্র পরিবেশের সান্নিধ্যে মানুষ হয়েছেন। তাঁর জীবন গড়ে ওঠার পশ্চাতে এ বহুমুখী পরিবেশের প্রভাব পড়েছে। সমকালীন পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবনাদর্শ হয়েছে সুদৃঢ়; তিনি হয়ে উঠেছেন নতুন মানুষ। তাঁর মানস গড়ে ওঠার পশ্চাতে যে সকল নিয়ামকগুলো সক্রিয় ছিল তা হলো তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ।

রণেশ দাশগুপ্তের বয়স যখন পাঁচ তখন তাঁদের পরিবার পুরুলিয়ায় নিবারণচন্দ্রের আবাসে চলে যান এবং রণেশ দাশগুপ্তকে একটি পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়া হয়। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় :

> "পুরুলিয়ার এই সময়কার জীবনধারাতে আমরা ভাই-বোনেরা সবাই হেড মাস্টারের বাড়ির উপযোগী চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত ছিলাম। জেঠামশাই ছিলেন অত্যন্ত কর্মমুখী। এত বড় একটা স্কুলের শিক্ষার দায়-দায়িত্বে গভীরভাবে আটক। আমাদের বাসস্থান তথা হেড মাস্টারের কোয়ার্টার ছিল সবরকম হৈচৈ থেকে দূরে।" [৩৯]

মায়ের কাছ থেকে গল্প শোনা, পুরুলিয়ার পরিবেশ এবং জেঠামশাই নিবারণচন্দ্রের জীবনাদর্শ শৈশবে রণেশ দাশগুপ্তের মানস গঠনে প্রভাব ফেলেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-'১৭) শেষে অপূর্বরত্নের পরিবারের সঙ্গে কিশোর রণেশ দাশগুপ্ত রাঁচিতে ফিরে যান এবং রাঁচি জেলা স্কুলে ভর্তি হন। বাংলা সাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি তাঁর মায়ের কাছেই। তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে :

> "আমার মায়ের কথা কিছু বলি --- রান্না ঘরেই বসতো আমাদের সাহিত্যের আড্ডা। তখন পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা উপন্যাসের কোনটিই তাঁর পড়ায় বাদ ছিল না। তবে মায়ের বিশেষত্ব ছিল এই যে, নিজে থেকে কোনদিন কোন উপন্যাসের কথা পাড়তেন না, প্রসঙ্গক্রমে কিংবা সেই সময়ের কোন ঘটনার কথা উঠলে মা বুঝিয়ে দিতেন, --- রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি মা মুখে মুখে বলতে পারতেন। --- পরবর্তীকালে আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, আমার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের মা-ই ছিলেন উদগাতা। --- বাংলা উপন্যাস নিয়ে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট মনীষীদের বিশেষ আলোচনা অবলম্বন করে আধুনিক ইউরোপীয় ধারায় মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনার গুরুগম্ভীর কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে কোন কোন সময় মনে হয়েছে মায়ের কথা বলি। --- মা আমার সাহিত্য সাধনার বহু কথাবার্তার উত্থাপক।' [৪০]

---

৩৯. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪০. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৭ ও ১৮

Dhaka University Institutional Repository

মূলত তাঁর পরিবারের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আদর্শ ধারণ করেই তিনি তিল তিল করে বেড়ে উঠেছেন।

কবি জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ চাকরি নিয়ে রাঁচিতে এলে রণেশ দাশগুপ্তকে পড়ানোর দায়িত্বটা তাঁর উপরই পড়ে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক। তাঁর নিকটই রণেশ দাশগুপ্তের বিশ্বসাহিত্য পাঠের হাতেখড়ি। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে :

> "সেই সময় অশোকদা ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য এনে পড়তেন এবং আমাকেও পড়াতেন। ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমি 'রেজারেকশন্' ও 'ওয়ার এন্ড পীস' পড়ে ফেলি। --- আমার তিনটে হ্যাবিট আমি তিনজনের কাছ থেকে পাই মা-র কাছ থেকে বাংলা সাহিত্য, অশোকদার কাছ থেকে ইংরেজি ও ক্লাসিকাল সাহিত্য আর বাবার কাছ থেকে খেলাধুলা।"[৪১]

এ 'হ্যাবিট' থেকেই তিনি পরবর্তী জীবনে আন্তর্জাতিক উপন্যাসচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই রণেশ দাশগুপ্তের মনে স্বদেশী ভাবনাও প্রবল হয়। ড. সৌমিত্র শেখরের মতে,

> "তিনি যখন পুরুলিয়া স্কুলের ছাত্র তখনই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্কুলে গোপনে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই অপরাধে কিশোর রণেশ দাশগুপ্তকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়।"[৪২]

এমনি রাজনীতি ও স্বদেশভাবনার মধ্য দিয়েই তিনি বড় হয়েছেন। বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা' তাঁকে বেশি অনুপ্রাণিত করে। তাঁর জেঠামশাই নিবারণ দাশগুপ্তের কাছেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। নিবারণ দাশগুপ্তের বন্ধু অতুলচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ কংগ্রেসের এম, এল, এ, ছিলেন। রণেশ দাশগুপ্তের রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রয়েছে। নিবারণ দাশগুপ্ত তাঁর সতীর্থদের নিয়ে পুরুলিয়াতে 'শিল্পাশ্রম' গড়ে তুলেছিলেন। এ 'শিল্পাশ্রম'-এর আসল কাজ ছিল রাজনৈতিক ভাবনার মত বিনিময়। এ 'শিল্পাশ্রম'-র সঙ্গে তৎকালীন বিপ্লবী নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

---

৪১. প্রাগুক্ত (পলাশ ভট্টাচার্য কর্তৃক নেয়া সাক্ষাৎকার) ; পৃ. ২৮ ও ২৯

৪২. ড. সৌমিত্র শেখর, প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী পুরুষ হরিপদ দে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্তের রাজনীতির দীক্ষাগুরু। রাজনীতির খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর কাছ থেকে তিনি প্রথমে আয়ত্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক শাসন, শোষণ ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয়গুলো সম্পর্কে হরিপদ দে, রণেশ দাশগুপ্তকে বুঝিয়ে দিতেন। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন :

> "আমরা থাকতাম ভুরাণ্ডায় আর হীনু পাড়ায় থাকতেন হরিপদ দা। এই পাড়ার মধ্যে একটা ছোট নদী ছিল। --- আমরা হীনুর থিয়েটার ও জিম্‌নেসিয়াম হলে যেতাম। জিম্‌নেসিয়ামের দু'জন শিক্ষকের মধ্যে একজন ছিলেন এই হরিপদ দে। আমরা প্রায় ১০/১৫ জন ছিলাম। হরিপদ দা একদিন আমাকে বললেন যে, এবার থেকে আমরা একটু আলাদাভাবে বসবো। প্রথম মিটিং-এ ৮/১০ জন ছিলাম। সেই সভা থেকে শোষণ, শাসন, অর্থনৈতিক বঞ্চনাদির কথাগুলি জানলাম এবং সেখান থেকেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা জানলাম।" [৪৩]

তৎকালীন কংগ্রেসের নেতা ড. পূর্ণচন্দ্রের ছেলে প্রতুল মিত্র ছিলেন রাঁচির 'তরুণ সংঘ'-র নেতা। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে 'অনুশীলন সমিতি'-র 'যুগবাণী সাহিত্যচক্র' নামে একটি শাখা ছিল। শ্রী দেবজ্যোতি বর্মণ এখানে আসতেন। এখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত 'কার্ল মার্কস' বইটি প্রকাশিত হয়। এ সাহিত্যচক্রে আলাপ-আলোচনার জন্যে আড্ডা বসতো। রণেশ দাশগুপ্তও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। আলোচনায় কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসে যেত। এখান থেকেই রণেশ দাশগুপ্তের মনে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হতে থাকে। এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর পরবর্তী জীবনে। সাম্যবাদী চিন্তা বা মার্কসীয় চেতনা তাঁর সমগ্রজীবনকে প্রভাবিত করেছে যার ছোঁয়া রয়েছে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থে। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে আই,এসসি, পাস করার পর রণেশ দাশগুপ্ত রামমোহন রায় হোস্টেলে থাকতেন। হোস্টেল তল্লাসীতে হোস্টেল সুপার রণেশ দাশগুপ্তের নিকট অনুশীলন সমিতির প্রচুর বই পেয়ে ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর পিতার নিকট রিপোর্ট গেলে তিনি রণেশ দাশগুপ্তকে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজিতে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। এ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি জেঠামশাই সত্যানন্দ দাশের 'সর্বানন্দ ভবন'-এ থাকতেন। সেখানে তিনি অনেক কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতি-

৪৩. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৩৩ ও ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বিদদের সান্নিধ্য পান। তাঁর জেঠিমা কুসুমকুমারী দাশ একজন কবি, জীবনানন্দ দাশও কবিতা লিখতেন। এদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য পান রণেশ দাশগুপ্ত। সর্বানন্দ ভবনে অবস্থানকালে রণেশ দাশগুপ্তের অনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তরুণ বিপ্লবী হিমাংশু, অমিয় দাশগুপ্ত, সুবোধ রায়, সুধাংশু দাশগুপ্ত, মতি মৌলিক, অমৃত নাগ, সত্য সেন, প্রমথ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, শান্তি সুধা ঘোষ, মণিকুন্তলা সেন ও প্রেমাংশু দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হলে পরবর্তীকালে বরিশালে প্রথম মার্কসীয় গ্রুপ তৈরি হয়। এ গ্রুপ থেকেই 'জাগরণী' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের হতো। পরবর্তীকালে 'জাগরণী গোষ্ঠী' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গড়ে ওঠে। রণেশ দাশগুপ্ত এ রাজনৈতিক গ্রুপের প্রধান হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে এ গ্রুপটি পরিচিতি লাভ করে এবং একসময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম বরিশাল জেলা শাখায় পরিণত হয়। সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠাই কমিউনিস্টদের একমাত্র আদর্শ। রণেশ দাশগুপ্ত কার্ল মার্কসের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করেছেন, পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা', আর ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন সোভিয়েত সাহিত্য। যার কারণে তিনি মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং মার্কসীয় চেতনার আলোকে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। এভাবেই তাঁর মনে মার্কসবাদ প্রভাব ফেলে।

১৯৩৮ সালে রণেশ দাশগুপ্ত ঢাকায় 'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ পত্রিকার সম্পাদক নলিনীকিশোরের মার্কসবাদী ভাবধারা রণেশ দাশগুপ্তকে প্রভাবিত করে এবং এ সময়েই রণেশ দাশগুপ্ত মার্কসবাদ ও মার্কসীয় সাহিত্যকেই 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় তুলে ধরেন। তিনি রজনীপাম দত্তের 'World Politics' এর কিছু অংশ নিজেই অনুবাদ করেন এবং তা এ পত্রিকায় ছেপে দেন। এভাবে মার্কস-লেনিন সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ এ পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯৩৯ সালে বোম্বের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোলি বাট্‌লিওয়ালা ঢাকায় আসেন। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর নিকট এগিয়ে যাবার প্রেরণা পান। ১৯৪০ সালে প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলনের দোলায় রণেশ দাশগুপ্ত কয়েকজন লেখক ও সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

> "সংক্ষুব্ধ সমকাল ও স্বদেশের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের জীবনের সংগে সাহিত্যের গভীরতর এবং সপ্রেম সংযোগ স্থাপনই ছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের মৌল লক্ষ্য শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করা, বিপ্লবের জন্যে শাণিত সোনালী হয়ে উঠতে সাহায্য করা এবং

Dhaka University Institutional Repository

> শোষণমুক্তির সংগ্রামে শামিল হওয়ার ডাক দেয়াই শিল্প-সাহিত্যের প্রধান কাজ - প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঙ্ঘের সংগঠকেরা এ-কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।" [৪৪]

এ বিশ্বাসবোধ থেকেই প্রগতির লেখকেরা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক প্রগতিশীল ধারার সূচনা করেন। অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সরলানন্দ সেন, সোমেন চন্দ, অমৃতকুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখের সহযোগিতায় রণেশ দাশগুপ্ত এ ধারাকে গতিশীল করে তোলেন। সরদার ফজলুল করিম এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "রণেশদা জানতেন, বিশ্বাস করতেন, মানুষের সমাজ, সমাজের নির্যাতিত মানুষ প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঙ্কটের মোকাবেলা করে নতুন এবং মহত্তর সমাজ তৈরিতে অগ্রসর হয়। রণেশদা বলতেন : আমি জনতায় বিশ্বাস করি। দেশ নির্বিশেষে জনতার মহৎ স্বপ্নের কোন মৃত্যু নেই। এই বিশ্বাস নিয়ে আজ থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বে সেদিনের যুবক, সাহিত্যিক এবং কর্মী রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর সহযোদ্ধা এবং সহকর্মী সোমেন চন্দ, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, অজিত গুহ প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘকে। তাঁর সেই সংঘই চল্লিশের দশকে মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দিন, ছানাউল হক, আবদুল মতিন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রগতিশীল মুসলিম তরুণ সাহিত্যিকদের আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘে। এই প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম এবং অসীম সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক ও সংগঠক সোমেন চন্দ ফ্যাসিবাদী চক্রের নির্মম আঘাতে নিহত হয়েছিলেন, ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে।" [৪৫]

সোমেন চন্দের এ নির্মম মৃত্যুতে রণেশ দাশগুপ্তের মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। তাঁর মনে সাম্প্রদায়িকতাবাদ-বিরোধী চেতনা আরও বেশি জাগ্রত হয়ে ওঠে। সোমেন চন্দের আত্মদানে 'প্রগতি লেখক সংঘ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ লেখক সংঘের অন্যতম সংগঠক হিসেবে রণেশ দাশগুপ্তের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। রাজপথে একাধিক মিটিং-মিছিল-প্রতিবাদ সভা করা হয়েছিল সেদিন।

---

৪৪. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত, (বিশ্বজিৎ ঘোষ রচিত 'ঢাকার প্রগতি লেখক-আন্দোলন ও রণেশ দাশগুপ্ত') ; পৃ. ২২১

৪৫. প্রাগুক্ত, (সরদার ফজলুল করিম রচিত 'রণেশদা'র কথা') ; পৃ. ১৯১ ও ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতির লেখকেরা শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আন্দোলনই করেন নি বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সমভাবে অংশ নিয়েছেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরকেন্দ্রিক সময়ে সময়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলতে থাকে। প্রগতির লেখকেরা এ দাঙ্গা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা দাঙ্গার পটভূমিতে গল্প, কবিতা প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করতেন। এ লেখক সংঘ-ই ১৯৪৩ -এর দুর্ভিক্ষের সময় বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে প্রাণান্ত সহযোগিতা থেকেই রণেশ দাশগুপ্তের পরবর্তী জীবনে সমাজভাবনার প্রগাঢ়তা ও রাজনৈতিক চেতনার ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে প্রগতি লেখকগোষ্ঠী, মার্কসবাদী ও ফ্যাসিবাদবিরোধী পাক্ষিকপত্র, 'ক্রান্তি, 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে রণেশ দাশগুপ্তের রাজনৈতিক এষণা আরও শাণিত হয়ে ওঠে।

রণেশ দাশগুপ্তের জীবন বৈচিত্র্যময়। তিনি জগদ্বিখ্যাত অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজসেবী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও পাণ্ডিত্যের মহৎ আদর্শে বড় হয়ে ওঠেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার। পারিবারিক ঐতিহ্য, পারি-পার্শ্বিক আবহ ও ব্যক্তিক সাধনা রণেশ দাশগুপ্তকে বিপ্লবী সাহিত্যিক ও ঋষিতে পরিণত করেছে। তিনি হয়ে উঠেছেন মানবতাবাদী আদর্শ কমিউনিস্ট। রাজনৈতিক কোন তুচ্ছতা, সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। এদেশের মাটি আর মানুষের কল্যাণকামনা মিশে আছে তাঁর সমগ্র সত্তায়। এ প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন :

> "প্রথম থেকেই রণেশদার প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা, সর্বপ্রকার কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ও পলায়নমুখী চিন্তামুক্ত স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি আমার মনে তাঁর জন্য গভীর শ্রদ্ধার আসন করে দেয়। সে আসন আমার চিত্তে তাঁর জীবনাবসান হওয়া পর্যন্ত অম্লান ছিল। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন থাকবে।" [৪৬]

---

৪৬. প্রাগুক্ত : (কবীর চৌধুরী রচিত 'রণেশ দাশগুপ্তের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি') : পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

যৌবনের প্রারম্ভেই রণেশ দাশগুপ্ত মার্কসবাদী ভাবাদর্শকে তাঁর জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর রচনায় মানবকল্যাণই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় বাংলা সাহিত্যসহ বিশ্বসাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন তিনি। এজন্যে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তিনি র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েলের তত্ত্বালোকে বাংলা, চিনা, সোভিয়েত, আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাসকে মার্কসীয় চেতনায় বিমিশ্রণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান এর উক্তি :

> "উপন্যাসের শিল্পরূপ' আমাদের নিশ্চিতভাবে রণেশদার মার্কসবাদী চিন্তার ধারণাটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। বস্তুবাদী বিচারের নামে আমাদের এখানে এবং পশ্চিমবঙ্গেও অনেক যান্ত্রিক সমালোচনা প্রচলন ছিল। 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' পড়লে বোঝা যায় যে, এর লেখক সবরকম যান্ত্রিকতার বিরোধী ছিলেন। সমাজসংলগ্ন হয়েও সাহিত্যের যে একটা স্বায়ত্তশাসন আছে, তার নিজস্ব গতিপথ এবং রীতিনীতি আছে, জীবনকে দেখার ও দেখাবার যে আলাদা ধরণ আছে, সেটায় তাঁর আস্থা ছিল।" [৪৭]

রণেশ দাশগুপ্ত এ যান্ত্রিক সমালোচনার তোয়াক্কা করতেন না। সমাজ ও জীবনকে তিনি নিজের মত করে দেখতে চেয়েছেন ; তাঁর মানসের প্রবণতাই ছিল এই।

রণেশ দাশগুপ্ত কারাগারে থাকাকালে (১৯৬৬) বাঙালির উপর পাকিস্তান সরকারের দুঃশাসন সত্ত্বেও এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন গতি সঞ্চার হয়। শিল্পীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ববোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বে একজন শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি দুরূহ ব্যাপার। শিল্পী যখন কোন কিছু আবিষ্কার করেন তা শুধুমাত্র নিজের জন্যেই করেন না, সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সামাজিক উপযোগিতার দিকটিও বিবেচনায় রাখেন। শিল্পীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে শিল্পীর সততার দিকটিও রণেশ দাশগুপ্ত বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছেন। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' গ্রন্থ প্রসঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের লেখা থেকে জানা যায় :

---

৪৭. প্রাগুক্ত, (আনিসুজ্জামান রচিত 'রণেশ দাশগুপ্ত') ; পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

"দুটি নিবন্ধ 'সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক গতিধারা' ও 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' ১৯৫৫ সালে কারাগারে থাকার সময় সাথী ছাত্রদের জন্য মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্যের উপর যে ক্লাস তারই লেখ্যরূপ, --- শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নের অন্য দুটি নিবন্ধ মূলত সমকালে প্রকাশিত।" [৪৮]

কারাগারের বন্দীদশাও রণেশ দাশগুপ্তের জীবনচেতনাকে রুদ্ধ করতে পারে নি। অতি স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর প্রাণের কথাগুলো প্রকাশ করেছেন; কখনও মুখে মুখে, কখনও বা লিখিতভাবে। কারাগারে বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর মানস-লোকে প্রভাব ফেলে।

শিল্প সৃষ্টির ব্যাপারে জনগণকে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি তাঁর অনেক প্রবন্ধে জনগণের শিল্প হিসেবে সাহিত্য, চারুকলা ও সংস্কৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এ সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর মনোলোক সুগঠিত হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা-উত্তর (১৯৭২) বাংলাদেশে রণেশ দাশগুপ্ত কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার কাজে যোগদান করেন। তিনি সাংবাদিকতা ছাড়াও সামাজিক অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত হন। এ-প্রসঙ্গে জানা যায়, তিনি-

"বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। প্রেসক্লাবে সাংবাদিক মহলের অভিভাবক, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য, খেলাঘরের কর্মীদের অনুপ্রেরণার উৎস, উদীচীর অন্যতম উপদেষ্টা, ঢাকার বিকাশমান নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বাংলা একাডেমীসহ ঢাকার বহু সাহিত্য-আলোচনার মূলবক্তা-এর সবগুলো দায়িত্ব তিনি সম্পাদন করেন অক্লেশে।" [৪৯]

এ বহুমুখী কর্ম-সম্পাদন তাঁর মানসজীবনে প্রভাব ফেলে।

এ অতি ব্যস্ত রণেশ দাশগুপ্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একজন অসাধারণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেশময় পরিচিতি লাভ করেন। এ সময়ে সংবাদ পত্রিকাসহ 'গণসাহিত্য', 'একতা' এবং 'একুশের সংকলন'-এ তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি সময়ে 'সংবাদ' বন্ধ করা হলে রণেশ দাশগুপ্ত সাংবাদিকতা ছেড়ে দেন এবং রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশে বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতা চলে যান। কলকাতা অবস্থানকালেও সেখানে তাঁর লেখনী থেমে থাকে নি।

---

৪৮. প্রাগুক্ত, (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ রচিত 'রণেশ দাশগুপ্ত : জীবনকথা') ; পৃ. ৪২

৪৯. প্রাগুক্ত ; পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সর্বদাই উদার দৃষ্টি ও চিরন্তন সৌন্দর্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্বের প্রতিভাবান লেখকদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বৃহত্তর মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির বাণী ধ্বনিত হয়েছে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে। রণেশ দাশগুপ্ত এ সংকলন গ্রন্থে দেশ-বিদেশের বিপ্লবী সাহিত্যে মার্কসীয় চেতনাকে অন্বেষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে দস্তয়েভস্কি, মায়াকভস্কি, এলেক্সি, টলস্টয়, নেরুদা, লুকাচ, শলোকভ, রবীন্দ্র, নজরুল, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেন, সোমেন চন্দ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের রচনা বিবেচনায় এসেছে।

রণেশ দাশগুপ্ত প্রকৃত অর্থেই একজন দেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি কামনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনায় সংগ্রামের স্বরূপ ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসকচক্রের চরিত্র শনাক্তকরণ, মুক্তিযুদ্ধের সঞ্চালক শক্তিগুলোর শ্রেণিগত ভূমিকা ও গুণাগুণ বিচার, সংগ্রামের অনুষঙ্গ বিবেচনা এবং দেশের মুক্তি সংগ্রামের আন্তর্জাতিকতা নির্ণয়ের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনায় এনেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা দিবস, সাম্যবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত প্রবন্ধসমূহে তিনি মুলত শোষণমুক্তি ও জাতীয় মুক্তির বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে সমবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রণেশ দাশগুপ্ত স্বপ্ন দেখতেন শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক ও ন্যায়ভিত্তিক এক সুষ্ঠ সমাজের। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল তীব্র। তাই সাম্যবাদী চিন্তা বা মার্কসীয় চেতনা তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে ঘুরে ফিরে বার বার এসেছে। তিনি সাম্যবাদের উত্থান দেখতে চেয়েছিলেন।

সমাজতন্ত্রের চরম বিপর্যয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারপরও তিনি ছিলেন আশাবাদী মানুষ। তাই চারদিকে হতাশার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতেন। স্বপ্ন-স্পৃষ্ট হয়েই তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সাম্যবাদী উত্থানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন। এসময় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে তাঁর যে মানসিক দৃঢ়তা লক্ষ করা যায় তা বিস্ময়কর। মনোগতভাবে আদর্শের ভিত কতটা শক্ত হলে যে তা সম্ভব, এশুধু অনুমানই করা যায়। তিনি শিল্প-সংস্কৃতি ও কতিপয় বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলির উপরও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার মধ্যে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থান কামনা করা হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের ইতিহাস-চেতনা থেকে রণেশ দাশগুপ্তের মনে এ চেতনা জন্ম নিয়েছিল। যা তিনি আমৃত্যু লালন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত আজীবন সংগ্রামী মানুষ। তাঁর সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ, দুর্নীতি, শোষক সর্বোপরী শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে। নীতির ক্ষেত্রে তিনি এক আপোসহীন ব্যক্তিত্ব। আর্থিক অভাব-অনটন-দারিদ্র্য তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতি অপরিসীম দরদ, সহানুভূতি ও মানবতাবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি অনন্যসাধারণ। তাঁর রচিত প্রবন্ধে সমাজ বা রাজনীতিচিন্তা যেমন প্রকাশিত, তেমনি সাহিত্য ও নন্দনচিন্তাও লক্ষযোগ্য। বাগিচা তৈরির শ্রমকে তিনি মূল্য দিয়েছেন সর্বাগ্রে, তাই বলে ফুলের সৌন্দর্যকে তিনি অবজ্ঞা বা অবহেলা করেন নি। শ্রম ও সৌন্দর্য, এই দুয়ে মিলেই রণেশ দাশগুপ্তের মনোদর্শন গঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধসাহিত্য : সূচনা

'প্রবন্ধ' শব্দটি উদ্ভব হয়েছে 'বন্ধ' ধাতু থেকে। 'বন্ধ' ধাতুর অর্থ 'বন্ধন করা'। 'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনযুক্ত বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বাক্যাবলি। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রবন্ধের মধ্যে একটা নৈয়ায়িক বন্ধনের, তার বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে একটি যুক্তিনির্ভর সম্পর্ক বিদ্যমানতার বিষয় থাকে। এ হিসেবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ যুক্তিসঙ্গত তথ্যনির্ভর রচনাই প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। বস্তুগত যুক্তি ও তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে যথার্থতা আবিষ্কার করা প্রবন্ধের রীতি। 'প্রবন্ধের প্রতিশব্দ হিসেবে রচনা, নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা কোন বিষয় সম্পর্কে গদ্যে রচিত আলোচনা।' [১] তাই কোন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বুদ্ধিদীপ্ত গদ্য রচনাকেই প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। 'প্রবন্ধ বলতে সাধারণত কাহিনী এবং নাটক নয়, এ জাতীয় গদ্য-আলোচনা মাত্রকে বোঝানো হয়।' [২] সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হতে পারে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। তবে,

> "গদ্যবন্ধের দুইটি শাখা। প্রথম শাখা উপন্যাস গল্প, দ্বিতীয় শাখা প্রবন্ধ। অর্থাৎ বাস্তব -অবাস্তব যে কোন বিষয়ে উপস্থাপিত আলোচনার সীমিতভাবে পর্যালোচনা বা বিচার। এই শাখার নাম প্রবন্ধ। এই অর্থে 'প্রবন্ধ' শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখি দ্বাদশ শতাব্দী হইতে। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ নামটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন কবি-ঐতিহাসিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬২ অব্দে তাঁহার পুস্তক 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে'। তাহার পর পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে' (১৮৮৭)।" [৩]

কালের বিবর্তনে 'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যবহার বিস্তার লাভ করে।

---

১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক), সংসদ বাংলা অভিধান, ২০০০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা; পৃ. ৫৪৭
২. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ১৯৯৮, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা ; পৃ. ২৫০
৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা ; পৃ. ৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি 'Essay' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে বাংলায় 'প্রবন্ধ' নাম প্রচলিত হয়েছে। 'Essay' কথাটির উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন ফরাসি শব্দ 'Essai' থেকে, যার অর্থ চেষ্টা বা Attempt এবং যার মধ্যে একটি ভাবের অসম্পূর্ণ দ্যোতনা আছে। সুনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় :

> "প্রাচ্যের 'প্রবন্ধ' শব্দের আদিম অভিধা বন্ধনযুক্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পাশ্চাত্যে 'Essay' শব্দের আদিম অভিধা খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। এই দুই বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ফারাক আসমান-জমিন। ব্যবধানটা সম্ভবত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন-জিজ্ঞাসার ইঙ্গিতবহ।" [৪]

বর্তমান পরিবর্তনশীল আধুনিক বিজ্ঞান-সভ্যতার যুগে উভয় শব্দেরই সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন আর শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই 'Essay'-র মধ্যে, যেমন এসেছে প্রবন্ধের ধাতুগত অভিধার বন্ধনযুক্ত, বিষয়াশ্রয়ী রচনার উপাদান, তেমনি 'প্রবন্ধের' মধ্যে এসে মিশেছে 'Essay'-র প্রধান বৈশিষ্ট্য - মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের স্বচ্ছন্দ বিহার। তাই পরিমিত আয়তনের একটি শিল্পসম্মত গদ্যরচনাকেই প্রবন্ধ বলা যায়। প্রবন্ধের সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে ড. অধীর দে যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপ :

> "সাধারণত কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বন করে লেখক যখন কোন ভাব বা বিষয় যুক্তিযুক্ত ও সংযতভাবে বা পরিপাটিরূপে গ্রন্থন করেন এবং প্রধানত সরস গদ্যরীতিতে ও দীর্ঘ বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে তার প্রকাশভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করেন, তখনই তাকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা যেতে পারে।" [৫]

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য সম্পূর্ণতা পেয়েছে ইংরেজি 'Essay' -র সোনার কাঠি-স্পর্শে। ইংরেজি 'Essay' যেমন বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যও তেমনি ব্যাপক ও বিশাল। একদিকে যেমন বিষয়নিষ্ঠ গবেষণামূলক প্রবন্ধের বিস্তার ঘটেছে অন্যদিকে তেমনি আত্মকথনমূলক নানা প্রকার রচনাতে প্রবন্ধশাখাটি ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে। বিষয়বস্তু ও রচনারীতির প্রভেদ ও বৈচিত্র্যময়তার কারণেই এর সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। Cassell -এর Encyclopaedia of Literature গ্রন্থে Essay -র পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

---

৪. সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবন্ধ : সংজ্ঞা এবং স্বরূপ, চতুরঙ্গ, ৪৯ বর্ষ, ১৯৮৮, কলকাতা ; পৃ. ৩০০

৫. ড. অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, প্রথম খণ্ড ১৯৮৮, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা ; পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

'It is now to be found applied to the most diverse forms of writing from the solemn and learned treatise to the slightest and most ephemeral effusion of the moment.' [6]

এ প্রসঙ্গে একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচকের মন্তব্য -

'The many subjects, purposes and manners of treatment make impossible any very narrow and binding definition of the genre.' [7]

সমালোচনার সুবিধার্থে প্রবন্ধসাহিত্যকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব বা তথ্যনির্ভর বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ (Formal বা Objective Essay) : এ ধারার রচনাকে ইংরেজিতে 'Dissertation', 'Discourse', 'Tract' বা 'Treatise' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হেন্‌রি হাড্‌সন্ লিখেছেন-

'When the so-called essay grows in bulk and comprehensiveness to the proportions, let us say, of Spencer's Essay on progress, the proper term for it is rather 'dissertation' or 'Treatise'. [8]

(খ) ব্যক্তিগত বা আত্মভাবপ্রধান প্রবন্ধ (Informal বা Subjective Essay) : এ ধারার রচনা-সমূহকে Familiar বা Personal Essay নামেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্পর্কে আর্থার ক্রিস্টোফার বেন্‌সনের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

'An Essay is a thing which some one does himself; and the point of the essay is not the subject, for any subject wills suffice, but the charm of personality.' [9]

---

6. Cassell, Encyclopaedia of Literature, vol. 1.1953, London ; P. 205
7. John L. Stewart (ed.), The Essay, 1952, New York ; P. XIII
8. William Henry Hudson, An Introduction to the study of Literature, 1958, London ; P. 332
9. C. H. Lockitt (ed.), The Art of the Essayist. 1954, London ; P. 139

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তি-চিন্তা প্রাধান্য পায়।

নিম্নবর্ণিত ছকের মাধ্যমে প্রবন্ধসাহিত্যের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো :

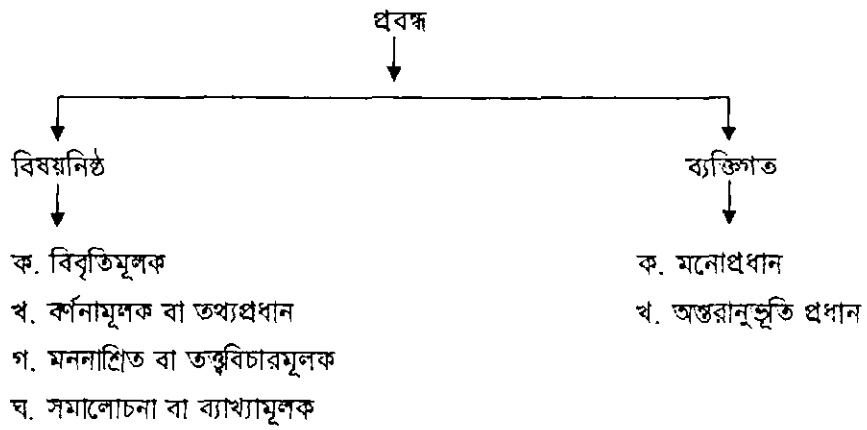

বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ বস্তুনির্ভর। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ব্যক্তি-চিন্তা নির্ভর। বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ বলতে ঐতিহাসিক বা সাময়িক ঘটনা প্রসঙ্গ, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্তমূলক রচনাকে বোঝায়। বর্ণনামূলক বা তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ বলতে রাষ্ট্র, সমাজ-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান বিচিত্রা, প্রকৃতিবিষয়ক রচনাকে বোঝানো হয়। মননাশ্রিত বা তত্ত্ববিচারমূলক প্রবন্ধ বলতে দর্শনতত্ত্বমূলক বা ধর্মীয় মতবাদ সংক্রান্ত রচনাকে বোঝায়। মনোপ্রধান প্রবন্ধ বলতে লেখকের বিচিত্র খেয়ালী-চিন্তা, ভাব প্রকাশের সুচতুর কৌশল ও লঘু হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুগম্ভীর আলোচনাকে বোঝায়। অন্তরানুভূতিপ্রধান প্রবন্ধে লেখকের হৃদয়ের তীক্ষ্ম ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মর্মগত বিচিত্র উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) লেখকদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ কলেজের বাংলা বিভাগের কর্তা উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাভাষী বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় যে সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে তোলেন তাতে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশ-পথ উন্মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এ কলেজের লেখকদের গ্রন্থের একটি তালিকা (১৮১৫পর্যন্ত) নিম্নে দেওয়া হলো :

লেখক	রচিত গ্রন্থের নাম	সন
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১
উইলিয়াম কেরী	কথোপকথন	১৮০১
গোলকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ	১৮০২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
রামরাম বসু	লিপিমালা	১৮০২
তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্সী	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	হিতোপদেশ	১৮০৮
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	হিতোপদেশ	১৮০৮
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	রাজাবলি	১৮০৮
উইলিয়াম কেরী	ইতিহাসমালা	১৮১২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮১৩
হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

রামরাম বসুর (১৭৫৭-১৮১৩) 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গদ্যে রচিত প্রথম জীবন-চরিত। এতে প্রবন্ধের লক্ষণ বিদ্যামান। 'লিপিমালা' লেখকের অপর প্রবন্ধ-সংকলন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩) একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সংকলন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থ-প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য :

> 'এক হিসাবে প্রবোধ-চন্দ্রিকা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলংকার স্মৃতি ব্যবহার নীতিবিদ্যা ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের মর্ম এবং বিবিধ রচনারীতি সংগ্রহকর্তার (অথবা লেখকের) পাণ্ডিত্যের পরিচয় সহ প্রকটিত হইয়াছে। এই রচনা গৌরবের জন্যই মার্শম্যান প্রবোধ-চন্দ্রিকার মুখবন্ধে গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তার প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন।'[১০]

সংস্কৃত, কথ্য ও সাধুরীতির অনুসরণে রচিত এ গ্রন্থটি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তিস্থাপনে, পরিকল্পনা ও প্রেরণার উৎস হিসেবে উইলিয়াম কেরী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

---

১০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ; পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধসাহিত্যের শারীরিক সুস্থতা অর্জনে কতগুলো সাময়িক পত্র বিশেষ অবদান রেখেছে। এ প্রসঙ্গে 'দিকদর্শন' (১৮১৮), 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২), 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), 'সংবাদ রত্নাবলি' (১৮৩২), 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৮৩৫), 'সংবাদ ভাস্কর' (১৮৩৯), 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩), 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩), 'জ্ঞানাঙ্কুর' (১৮৭২), 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) ও 'জন্মভূমি' (১৮৯০) প্রভৃতি পত্রিকার নাম স্মর্তব্য।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা লক্ষ করে নিম্নবর্ণিত লেখকগণ এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে উঠেন এবং পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন প্রবন্ধকারের আবির্ভাব ঘটে। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) প্রথম ভাষানিপুণ, যুক্তিনিষ্ঠ-বিচারপ্রধান প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থে চিন্তার বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে। রামমোহন রায় সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্য :

> 'আধুনিক কালে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বাংলাদেশের দার্শনিক জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের পরিপাটি সাধনে তিনি যত্নবান হইয়াছিলেন।' [১১]

ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারমূলক রচনার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূচনা করেন। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) সাংবাদিক, গ্রন্থকার ও তার্কিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরেজ সংস্পর্শে প্রথম যুগে তিনি সামাজিক বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'দূতী-বিলাস' (১৮২৫) ও 'নববিবি-বিলাস' (১৮৩০) প্রভৃতি। এসব সরস ব্যঙ্গ নিবন্ধের মাধ্যমে কৌতুকরস সৃষ্টি করে লেখক ধনী রসিকদের মনোরঞ্জন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কতকটা রামমোহন রায়ের ধারাকে অনুসরণ করেছেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যে প্রথম তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনার ধারার সূত্রপাত করেন। সে প্রবন্ধের নাম 'শকুন্তলা, দেসডিমোনা ও মিরণ্ডা'। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) ও 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৬৪) উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যার অকাল মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে তিনি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' ক্ষুদ্র

---

১১. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

নিবন্ধটি রচনা করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম- ১৮৫২, ২য়- ১৮৫৩), 'ধর্মনীতি' (১৯৫৬) তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রবন্ধের

> 'প্রথমভাগে শারীরবৃত্তির মিতাচার ও জীবনযাত্রার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিচার এবং নিরামিষ ভোজনের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ধর্ম ও সমাজের নিয়ম প্রতিপালন এবং সুরাপানের দোষ বিচারিত হয়েছে। বইটির প্রভাবে সেকালে কেহ কেহ জীবনযাত্রাপ্রণালী পরিবর্তিত করিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।' [১২]

প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) ভাষারীতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিত' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রচনা। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) শিক্ষা-সমাজ-ধর্ম-ইতিহাস-সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬), 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (১৮৬১), 'সেকাল ও একাল' (১৮৭৪), 'ব্রহ্মসাধন' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৭৯) উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৩-১৯১০) প্রবন্ধে চিন্তার প্রসারতা ও ভাবগাম্ভীর্য লক্ষ করা যায়। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'সমাজ শোধনী' (১৮৭২), 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৭৬), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৯৪), 'নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬) ইত্যাদি। শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন 'বঙ্গসমাজ' (১৮৯৭) উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান সাহিত্যিক হিসেবে স্মরণীয়। তিনি ইতিহাস, সমাজ, জীবন ও ধর্ম বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'গো-জীবন' (১৮৮৮),

---

১২. সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫২-১৯৩১) 'ভারত মহিলা' 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' 'বৌদ্ধধর্ম' উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। সিদ্ধান্তমুখী মানসিকতা ও রচনার প্রঞ্জলতার গুণে তাঁর প্রবন্ধাবলি আকর্ষণীয়, সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রেও নবদিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধ যেমন রচনা করেছেন তেমনি আত্মজীবনী, ডায়েরি, পত্রাবলি প্রভৃতি নানা ধরণের সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধও রচনা করেছেন।'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে','সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ। 'শব্দতত্ত্ব', 'ছন্দ', 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রভৃতি তাঁর ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ। 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', 'রাজাপ্রজা', 'স্বদেশ', 'পরিচয়', 'কালান্তর', 'সভ্যতার সংকট' প্রভৃতি তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। 'ধর্ম', 'শান্তি নিকেতন', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'চারিত্র্যপূজা' 'পঞ্চভূত' ও 'লিপিকা' গ্রন্থে মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং 'য়ূরোপযাত্রীর পত্র', 'য়ূরোপযাত্রীর ডায়েরি', 'জাপানযাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', প্রভৃতি রচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবন বিধৃত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯৩৩) রাবেন্দ্রিক যুগের একজন শক্তিমান প্রাবন্ধিক। 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'কর্মকথা' (১৯১৩), 'শব্দকথা', 'চরিতকথা' (১৯১৩) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। জ্ঞান বিজ্ঞানের চিন্তাধর্মী রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বাংলা গদ্যের এক বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তক। তিনি 'তেল-নুন-লাকড়ী' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানাকথা' (১৯১৯), 'নানাচর্চা' (১৯৩২) প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলি', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যবিতান', 'সাহিত্যবিচার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্য বিচারের দিক থেকে তাঁর প্রবন্ধাবলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এ ধারাবাহিকতায় বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর সৃষ্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রবন্ধসাহিত্য নতুন উদ্যোগে বেগপ্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশের উপন্যাস, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যধারার মধ্যে শুধু প্রবন্ধ সাহিত্যে দ্রুত পরিণতির ইঙ্গিত মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশে প্রবন্ধসাহিত্য

বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সৃজনশীল অনেক ব্যক্তিত্ব বিভাগ-পূর্ব (১৯৪৭-এর পূর্ব) কাল থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা তাঁদের মেধা, শ্রম ও প্রতিভার মাধ্যমে কেবল প্রবন্ধসাহিত্যের ভিত্তিভূমিই প্রতিষ্ঠা করেন নি বরং প্রবন্ধসাহিত্যের উত্তরণ ও বিকাশ-পথকেও করেছেন সুপ্রশস্ত। তাছাড়া পাকিস্তান আমলে উত্তাল সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এ প্রবন্ধসাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইঙ্গিত। বৈষম্য, নিপীড়ন এবং এ থেকে মুক্ত হয়ে শোষণমুক্ত সমবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনজাগরণ সৃষ্টির জন্যে অনেকে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এভাবে আজকের ঋদ্ধিমান প্রবন্ধসাহিত্যের সূচনা। এ সময় যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) : তিনি মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রথাগত ধারণার মধ্যে নবতর মাত্রা সংযোজন করেছেন। 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) : তিনি পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যপ্রীতির সমন্বয়ে তাঁর রচনা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (দু'খণ্ড) গ্রন্থে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসের যে স্বরূপ তুলে ধরেছেন, তাতে ঐতিহ্যনিষ্ঠার সাথে যুক্ত হয়েছে আবিষ্কারপ্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের বহু জটিল সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৫) : তিনি পারস্য প্রতিভা (১ম -১৯২৪, ২য় -১৯৩২) নামক গ্রন্থটি লিখে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পারস্য-সাহিত্যের স্বর্ণযুগের ইতিহাস, কবিজীবন, সাহিত্য-বিশ্লেষণ ও রচনাশৈলীর অভিনবত্বে গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) : 'নজরুল-কাব্য পরিচিতি', 'গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস', 'আলোক বিজ্ঞান', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রবন্ধসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের

Dhaka University Institutional Repository

ধারায় কাজী মোতাহার হোসেন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) : তিনি মূলত গদ্যশিল্পী। 'সংস্কৃতি কথা' (১৯৫৮), 'সভ্যতা' (১৯৬৫), 'সুখ' (১৯৬৮), প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ-গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন। এ গ্রন্থের 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেখানে তিনি মানুষের দু'টি সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন -একটি জীবসত্তা অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। এ প্রবন্ধে তিনি যে কথাটি বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন তা হলো, শিক্ষার আসল কাজ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো। মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন (১৯০৪-১৯৮৭) : 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (১৯৬৬) তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মুসলমানদের সাহিত্যিক অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকদের পর্যাপ্ত তথ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এ গ্রন্থে । আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) : তিনি মূলত একজন চিন্তাশীল ও সমাজমনস্ক প্রবন্ধকার। তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্য, সমাজ, 'সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র' সম্পর্কে গভীর ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'বিচিত্র কথা' (১৯৪০), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা' (১৯৬১), 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন' (১৯৬৫), 'সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র', 'সমকালীন চিন্তা' (১৯৭০), 'সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলাদেশের মননশীল সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে জীবনভাবনা ও সাহিত্যভাবনার মৌলিকত্বে বিশিষ্ট। স্বদেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিকতা তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) : তিনি মূলত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর 'চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ', 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য', 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে যৌথভাবে), 'বঙ্গে সুফী প্রভাব', 'বাংলা ভাষার সংস্কার', 'পূর্বপাকিস্তানে ইসলাম', 'মনীষামঞ্জুষা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ' এনামুল হকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধটি 'মনীষামঞ্জুষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রবন্ধে লেখক যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, বাংলা নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে জাতি একটি ঐতিহ্যকে লালন করে। এ দিনটি উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালির সত্যিকার পরিচয় উন্মুক্ত হয়। মানুষ অতীতকে ভুলে নতুনের আহ্বানে সাড়া দেয়। এ দিনে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সামাজিকতা, লৌকিকতা, সম্প্রীতি ও সৌজন্যবোধের বিকাশ ঘটে।

জীবন ও সমাজমনস্কতায় প্রাগ্রসর সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে সৈয়দ মুর্তজা আলী (১৯০৩-১৯৮১), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮), প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮) : তাঁর প্রবন্ধের বিশেষত্ব হলো সমাজমনস্ক

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাগ্রসর জীবনভাবনা ও কৌতুকপ্রিয়তা। চিন্তার স্বচ্ছতা ও অনুভূতির ঐকান্তিকতায় তাঁর প্রবন্ধ পাঠকমনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম।

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির সূচনা হয়, তাতে এক শ্রেণির প্রতিশ্রুতিশীল লেখক পাকিস্তানবাদের সম্মুখবর্তী হন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সাধন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। আর তখনই শুরু হয় তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা। এ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার পথিকৃৎ ছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। মুহাম্মদ আবদুল হাইও ছিলেন যুগপৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক। তাঁদের গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ। এঁদের ছাড়াও যে সকল প্রবন্ধকার বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তাঁদের সাহিত্য-কর্ম নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) : তাঁর প্রবন্ধে আবেগ ও মননের পরশ পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে এবং তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে সাহিত্য-শিল্পের উপাদান আহরণ করেছেন। 'অনুভবের লীলা' এবং 'চেতনাপ্রবাহের বিচিত্র গতি' তাঁর প্রবন্ধকে উন্নীত করেছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ড্রাইডেন ও ডি.এল.রায়', 'মীর মানস', 'বাংলা গদ্যরীতি' উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলো হচ্ছে - 'রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর', 'নজরুল - কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ন', 'আধুনিক নাটক', 'নাট্যসাহিত্য', 'শেক্সপীয়ার', 'আধুনিক উর্দু কবিতা', 'কামাল চৌধুরীর কবিতা' ইত্যাদি। আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) : তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্যিক প্রয়োজনের সাথে সামাজিক দায়িত্ববোধকে একান্ত করে দেখিয়েছেন। 'সাহিত্য সংস্কৃতি-চিন্তা' (১৯৬৯), 'স্বদেশ অন্বেষা' (১৯৭০) প্রভৃতি তাঁর এ পর্বের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গবেষণা। ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২) : তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তাঁর 'শরৎ প্রতিভা' (১৯৬০), 'বাংলার কবি মধুসূদন' (১৯৬১), 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজ ও বাংলার নাটক (১৯৬৪) প্রভৃতি প্রবন্ধ-গবেষণা বিষয়-উন্মোচনের ঐকান্তিকতায় উজ্জ্বল। 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে নীলিমা ইব্রাহিম শরৎ-সাহিত্যের বিষয় ও শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে তিনি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। 'বাংলার কবি মধুসূদন' গ্রন্থে তিনি মধুসূদনের কবিমানস ও বাঙ্গালি-সত্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'উনবিংশ শতব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক' গ্রন্থে মূলত উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

নানামাত্রিক প্রবণতা ও নাটক রচনার পটভূমি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন :

> "উনিশ শতকের নাটকসমূহকে গবেষক যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন --- তাঁর শ্রেণীকরণ নিম্নরূপ -'কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় নাটক', 'ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মদ্যপানাসক্তি ও তার প্রতিকার কল্পে রচিত নাটক', 'জাতীয়তা প্রচারমূলক নাটক', 'নারীকল্যাণ কামনায় রচিত নাটক', 'ধর্মমূলক নাটক' এবং 'বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রচিত নাটক'।" [১]

নাটকের বিশ্লেষণ-ক্ষেত্রে তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) : তিনি সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বকে প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আবেগ ও মননের সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলি গভীর মনোনিবেশ জাগ্রত করে। তাঁর 'নজরুল ইসলাম' (১৯৫৪), 'কবি মধুসূদন' (১৯৫৭), 'কবিতার কথা' (১৯৫৭), কবিতার কথা ও অন্যান্যবিবেচনা' (১৯৬৮), 'আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে' (১৯৭০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গবেষণা। 'কবি মধুসূদন' গ্রন্থে তিনি কবি মধুসূদনের জীবনী ও তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের উপর আলাদা আলাদাভাবে পর্যালোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে 'মেঘনাদবধ কাব্যে মানব ভাগ্য', 'মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ চরিত্রের পূর্ণতা', 'মেঘনাদবধ কাব্যে উপমা' ও 'মধুসূদনের কাব্য : আঙ্গিক বিশ্লেষণ' প্রবন্ধাংশে লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি লক্ষণীয়। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৯-১৯৮৪) : তিনি সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার রূপ-প্রকৃতি ও শিল্পোৎকর্ষ নির্ণয়ে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। 'কবি ফররুখ আহমদ' এবং 'জসীমউদদীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা' গ্রন্থদ্বয় গবেষণামূলক রচনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১) : তিনি রবীন্দ্রপ্রেমিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-গবেষক। তাঁর 'রবি পরিক্রমা' এবং 'সাহিত্যের নব রূপায়ন' গ্রন্থদ্বয়ে রাবিন্দ্রিক ভাষারীতির স্নিগ্ধ-কোমল মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে। বদর উদ্দীন উমর (১৯৩১-) : পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশ পর্বে বদর উদ্দীন উমরের গবেষণাধর্মী ঐতিহাসিক দলিল 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (১৯৭০) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থটি ভাষা আন্দোলন ও রাজনীতি সম্পর্কিত ব্যাপক ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে প্রথম খণ্ডে রাজনীতির সূত্রপাত প্রথম

---

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা, ২০০৩, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লিমিটেড, ঢাকা ; পৃ. ৭১ ও ৭২

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংগ্রাম, পূর্ব বাংলায় কায়েদে আজম, নাজিমুদ্দিন সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের অগ্রগতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের উত্থান, পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ও পরবর্তী পর্যায় প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬-) : তিনি ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর সমালোচকসত্তা এবং সাহিত্যবোধকে নির্মাণ করেছেন। 'অন্বেষা' (১৯৬৪) এ পর্বের তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গবেষণা। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-) : তিনি চিন্তানির্ভর সাহিত্য-গবেষক। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' তাঁর এ পর্বের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি কল্পে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা এবং আধুনিক কবিতা ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি চিত্রকলার সমালোচনাপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর আলোচনায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-) : তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) বাংলা প্রবন্ধ-গবেষণার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লেখক এ গ্রন্থকে প্রধানত দুটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্বে ১৭৫৭ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় পর্বে সাহিত্যের যুগ-বিভাগ নির্দেশ পূর্বক মধ্য ও আধুনিক যুগের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য, তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনা অন্বেষণ করে পর্যালোচনা করেছেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,

> "কালের হিসেবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাধনায় মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব পরে হলেও, খুব দেরীতে হয়নি। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের এক যুগের মধ্যেই মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয়।" [২]

এ পর্যায়ে তিনি মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫২), মোজাম্মেল হক (১৯৬০-১৯৩৩) ও আরও অনেক মুসলমান লেখকের রচনাবলি থেকে তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধসাহিত্য এই নিরিখেই আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় তিনি একজন ধীমান ও পথসন্ধানী লেখক। বাংলাদেশে গবেষণা ও প্রবন্ধের যদি দুটো ভিন্ন ধারা বিবেচনা করা হয়, তবে প্রবন্ধধারায় রণেশ দাশগুপ্ত সূচনাকারীদের একজন, নিঃসন্দেহে।

---

২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৯৯, বইপাড়া পাবলিকেশনস্, কলকাতা ; পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবন্ধসাহিত্য

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ স্বাধীনতা-উত্তর সময় প্রবাহে সংগ্রাম, রক্তপাত, সামাজিক উত্থান-পতন ও জাগরণের মধ্যদিয়ে আমাদের জাতীয় চৈতন্য যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, দেশের মননশীল সচেতন লেখকগোষ্ঠী তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্যচর্চার বিকাশ-কল্পে অতীতের গৌরবময় ইতিহাসকে লালন করে সমাজ, শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের পথ পরিক্রমায় এগিয়ে চললেন এ সময়ের লেখকসমাজ। তাঁদের রচনায় যুক্ত হলো নতুন মাত্রা আর প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠলো বৈচিত্র্যময়। স্বাধীন বাংলাদেশ পর্বের (১৯৭১ থেকে বর্তমান) প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অনেকেই পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশ পর্ব (বিভাগোত্তর : ১৯৪৭-১৯৭১) থেকেই প্রবন্ধ রচনা শুরু করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ লোকান্তরিত হয়েছেন, কেউ বা অদ্যাবধি প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন। এসব প্রবন্ধকারদের লেখনী-স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে এখনও প্রবহমান। এ প্রবহমানতায় যাঁরা প্রবন্ধ রচনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন :

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) : স্বাধীনতা উত্তর পর্বে তাঁর 'শুভবুদ্ধি' (১৯৭৪), 'শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি' (১৯৭৮), 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' (১৯৭৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধে শিল্প, সাহিত্য ও সমকালীন প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) : তাঁর 'বিচিত চিন্তা' (১৯৮৬), 'যুগযন্ত্রণা'(১৯৭৪), 'কালিক ভাবনা' (১৯৭৪), 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' (১ম খণ্ড -১৯৭৮, ২য় খণ্ড -১৯৮৩), 'ইদানিং আমরা' (১৯৮৬), 'বাঙ্গালি চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা' (১৯৮৭), 'এবং আরো ইত্যাদি' (১৯৮৭), 'একালে নজরুল' (১৯৯০), 'সময় সমাজ মানুষ' (১৯৯৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গবেষণা। 'এবং আরো ইত্যাদি' তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ-সংকলন। এ গ্রন্থে মোট উনিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো হচ্ছে 'আমার চেতনায় জীবন ও জগৎ', 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি'। 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি', 'নৈতিকতা বনাম অবক্ষয়', 'গণমুক্তির পূর্বশর্ত', ' 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা' (১৯৭৪) 'কে ধরবে হাল কে উড়াবে পাল', 'রবীন্দ্রসাহিত্য ও গণমানব', 'নাটকের গোড়ার কথা'

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। তিনি 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' প্রবন্ধে সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে :

> "সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত প্রকৃতিনির্ভর প্রাণীর অর্জিত আচরণই সংস্কৃতি। --- আমাদের আশৈশব লালিত যুক্তি-বুদ্ধি বিশ্বাসের ও রুচির এবং শ্রেয়বোধের মত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের যা কিছু নতুন ও অবাঞ্ছিত, তাই অপসংস্কৃতি নয়।" [১]

সংস্কৃতি আমাদের প্রাত্যহিক চলমান জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গতিশীলতার মধ্য দিয়েই সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার বিকাশ-পথে এগিয়ে চলে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিকাশমান সংস্কৃতিকে জীবন্ত ও বাড়ন্ত বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সমাজের চোর-ডাকাত-খুনী-লম্পট-প্রতারকদের বৃক্ষের মৃত ডালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য-১ম খণ্ড' লেখকের অন্যতম গবেষণা গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিকে লেখক পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। ১ম অধ্যায়ে লেখক দেশ-কাল ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বাঙালি জাতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ২য় অধ্যায়ে বাঙালির ধর্মচিন্তা, ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ৩য় অধ্যায়ে চর্যাগীতির পরিচিতি, গুরুত্ব, সমাজচিত্র ও সাহিত্যমূল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ৪র্থ অধ্যায়ে জাতীয় মহাকাব্যসহ মধ্যযুগের বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে গ্রন্থকার ধর্মঠাকুরতত্ত্ব ও সাহিত্য, নাথপন্থ ও নাথসাহিত্য, সহজিয়া বাউল মত ও সাহিত্য এবং বাঙলার সুফীসাহিত্য ও কবিদের উপর আলোচনা করেছেন। বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য-চর্চা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> "মুসলিমরা ইতিহাসপ্রিয় বলে সুনাম আছে। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য তেরো শতক থেকে ষোল শতক অবধি বাঙলায় বসে কেউ বাংলাদেশের রাজনীতিক ইতিহাস রচনা করেন নি।" [২]

এ থেকে মুসলমানদের ইতিহাস রচনার দীনতা লক্ষ করা যায়।

---

১. আহমদ শরীফ, এবং আরো ইত্যাদি, ১৯৮৭, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ; পৃ. ৯৬, ১০১ ও ১০২

২. আহমদ শরীফ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড), ১৯৭৮, নিউ এজ পাবলিকেশনস্, ঢাকা ; পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

বদর-উদ্দীন উমর (১৯৩১-) : তাঁর প্রবন্ধে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর 'যুদ্ধ-পূর্ব বাংলাদেশ' (১৯৭৪), এবং 'যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ' (১৯৭৬) গ্রন্থদ্বয় স্বাধীনতা-উত্তর প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ ছাড়াও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (১৯৭৪), 'বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র' (১৯৮২), 'বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি' (১৯৮৯), 'ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (১৯৯০), 'নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ-১' (১৯৯৩) গ্রন্থগুলোও বিশেষভাবে আলোচিত। 'বাংলাদেশের বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র' গ্রন্থের মোট ২৩টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংকট ও সাম্রাজ্যবাদ', 'ইসলামী ছাত্র শিবিরের শুদ্ধি অভিযান', 'বুর্জোয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতার লড়াই', 'জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের রাজনীতি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংকট ও সাম্রাজ্যবাদ' প্রবন্ধে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বুর্জোয়া মহলের রাজনৈতিক সংকট মূলত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতিতে ব্যবসায়ীর বুর্জোয়া শ্রেণির অনিয়ন্ত্রিত প্রাধান্যই এ রাজনৈতিক সংকটের মূল কারণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> "কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে এই প্রাধান্যের ফলে একদিকে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে বিরাজ করেছে ব্যাপক নৈরাজ্য, উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে এবং অপরদিকে আমাদের জাতীয় উদ্বৃত্ত (অর্থাৎ পুঁজি) বর্দ্ধিত হারে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনী দেশগুলোতে হচ্ছে হস্তান্তরিত। পাকিস্তানী আমলে পূর্ব বাংলা থেকে যে হারে এই উদ্বৃত্ত পশ্চিম পাকিস্তান ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে হস্তান্তর করা হতো, বর্তমানে তার থেকে অনেক বেশি উচ্চ হারে তা হস্তান্তরিত হচ্ছে।" [৩]

এ কারণেই আমাদের দেশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। লেখক অর্থনৈতিক এ সংকটটি নিয়ে তাঁর প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) : তিনি মূলত কবি হলেও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছেন। তাঁর 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৯৭৩) এবং 'আলোকিত গহ্বর' (১৯৭৭) গ্রন্থদ্বয় স্বাধীনতা-উত্তর কালের উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্যভাবনা ও সমাজ-মানুষের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

---

৩. বদরউদ্দীন উমর, বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র (১৯৮২), ওজে পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; পৃ. ১৪ ও ১৫

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ রফিক (১৯২৯-) : জীবনবোধ ও সাহিত্যভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন' এবং 'আরেক কালান্তরে' গ্রন্থদ্বয়ে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬-) : তাঁর প্রবন্ধ আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর রচনার আঙ্গিক ও গদ্যের রূপ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। 'দ্বিতীয় ভুবন' (১৯৭৩), 'নিরাশ্রয় গৃহী' (১৯৭৩), 'আরণ্যক দৃশ্যাবলি' (১৯৭৪), 'অনতিক্রান্তবৃত্ত' (১৯৭৪), 'শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ' (১৯৭৫), 'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক' (১৯৭৬), 'স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি' (১৯৭৯), 'বৃত্তের-ভাঙা-গড়া' (১৯৮৪), নেতা জনতা ও রাজনীতি' (১৯৮৬), রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি (১৯৯৩), প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে সংস্কৃতির উপর রাষ্ট্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে মোট সতেরটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'গণতন্ত্র ও কবিতা', 'মর্মবস্তুতে রদবদল', 'ভাষা, আমলাতন্ত্র ও সামন্তবাদ', 'গণতন্ত্র ও দারিদ্র্য', 'সাহিত্যের রাষ্ট্রবিরোধিতা' বিশেষ গুরুত্বপ্রাপ্ত। সাহিত্যের কাজ আর রাষ্ট্রের কাজ এক নয়। উভয়ের মধ্যকার ব্যবধানটুকু লেখক তাঁর 'সাহিত্যের রাষ্ট্রবিরোধিতা' প্রবন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের কাজ হলো- শাসক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা। সাহিত্যের কাজ হলো- মানুষের ভেতর বিবেকবান, সংবেদনশীল মানুষটিকে জাগিয়ে তোলা ; তাকে সতেজ রাখা। আর এখানেই যত বিরোধ। তাঁর মতে :

> "সাহিত্য দেশ মানে না। কাল মানে না। শুধু মানে না বললে যথেষ্ট বলা হবে না, সাহিত্য ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বটাকে তুলে ধরে। সাহিত্য স্থান ও কাল-বিরোধী যতটা নয়, রাষ্ট্রবিরোধী সে-তুলনায় অনেক বেশী।" [৪]

---

৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, ১৯৯৩, আফসার ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ; পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

লেখক ইংরেজি সাহিত্যের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত সহযোগে সাহিত্য ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বাত্মক চিত্র তুলে ধরেছেন। আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-) : তিনি গবেষণা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬), তাঁর উল্লেখযোগ্য 'প্রবন্ধ-গ্রন্থ' এবং 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (১৯৮৫), তাঁর অন্যতম গবেষণা-গ্রন্থ। পুরোনো বাংলা গদ্য বলতে লেখক ১৮০০ খ্রি: পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যকে বুঝিয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থের আলোচনাকে প্রস্তাব, উপকরণ, বিকাশ এবং বৈচিত্র্য এ চারটি অংশ বা অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের কিছু কিছু নিদর্শন তুলে ধরেছেন। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণে, আরণ্যক, উপনিষদ ও কল্পসূত্রে, এমনকি মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও ভগবত পুরাণেও গদ্যের প্রভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে :

> "কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ বোধ হয় সর্বপ্রথম (১৮৮৫) এই মত প্রচার করেন যে, ষোড়শ শতাব্দী বা তার কিছু আগে থেকে বাংলা গদ্যের সূচনা লক্ষ করা যায়। প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব-বিষয়ক কিছু গদ্য রচনার, তবে তাঁর যুক্তির শৃঙ্খলা ছিল দুর্বল। তিনি জোর দিয়েছিলেন কথকতার রীতি ও শব্দগত ব্যুৎপত্তির ওপরে আর বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসকে গণ্য করেছিলেন বাংলা 'প্রথম গদ্য লেখক' বলে।" [৫]

বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক রূপটি লেখক বহু পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্ধৃতি ও প্রমাণ-সাপেক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের আলোচনায় শূন্যপুরাণ, সেক শুভোদয়া-কে বাংলা গদ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বেশ কতগুলো বৈষ্ণব নিবন্ধের আলোকে বাংলা গদ্যের রীতিনীতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯) : তাঁর প্রবন্ধে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ ও রাজনীতি তাঁর প্রবন্ধের মূলসুর। তাঁর 'শিল্পীর রূপান্তর' (১৯৭৫) এবং 'কথা ও কবিতা' (১৯৮১) প্রবন্ধ-গ্রন্থদ্বয়ের নতুন যাত্রা প্রযুক্ত। তাঁর 'কথা ও কবিতা' প্রবন্ধ-গ্রন্থে মোট এগারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'সংবাদপত্রে সমাজ-সমালোচনা', 'বাংলাদেশের গদ্যচর্চা', 'বিষাদসিন্ধু', 'বাংলাদেশের কথা সাহিত্য : বিষয় আশয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বাংলাদেশের গদ্যচর্চা' প্রবন্ধে তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ পর্বের এবং গদ্য রচনারীতির ধারণা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখযোগ্য কথা সাহিত্যিকদের রচনাদর্শনের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন :

---

৫. ড. আনিসুজ্জামান, পুরোনো বাংলা গদ্য, ২য় সং, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

"সাহিত্যশিল্পীর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা তাঁর ভাষা। আবহমান কাল ধরে প্রচলিত ভাষার সংকেতগুলো এক সময়ে নির্ধারিত হয়ে যায়, সংকুচিত হয়ে যায়। কিন্তু ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে জীবন রূপান্তরিত হয়, বদলে যায় সমাজ ও মানুষ। নতুন মানুষের নতুন অনুভূতি প্রকাশের প্রথম প্রতিবন্ধক পুরনো ভাষা। কেবল মৌলিক শিল্পীই ভাষার এই সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে তার নতুন সম্ভাবনার সংকেত দিতে পারেন।" [৬]

একজন সার্থক সাহিত্য-শিল্পী যে কোন প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙেচুরে অনাগত কালের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল সে বিষয়টিই তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন। হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-) : তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'কথাসাহিত্যের কথকতা' (১৯৮১) এবং 'অপ্রকাশের ভার' (১৯৮৮)। কথাসাহিত্যের বিবেচনার ক্ষেত্রে তাঁর 'কথাসাহিত্যের কথকতা' গ্রন্থটি নবতর মাত্রা সংযোজন করেছে । হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯-) : তিনি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : কিশোর জীবনী' এবং 'মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা' গ্রন্থদ্বয়ে বিচিত্র উৎস আহরণ, যুক্তি ও মননের তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-) : তিনি স্বাধীনতা -পূর্ব থেকেই সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশুদ্ধ জন-চেতনার মধ্যেও তিনি সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটেও তিনি একজন প্রগতিশীল লেখক। তাঁর লেখা নিরীক্ষাধর্মী। 'শুদ্ধতম কবি', 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', 'নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা', 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা', 'বেগম রোকেয়া' (১৯৮৩) ও 'বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা' (১৯৯৪) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বিষয়ক গ্রন্থ। 'বেগম রোকেয়া' গ্রন্থে তিনি বেগম রোকেয়ার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনার পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের প্রথম পর্বে বেগম রোকেয়ার পরিচয় তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় পর্বে বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কর্মের উপর মূল্যবান আলোচনা করেছেন। আর তৃতীয় পর্বে বেগম রোকেয়ার সমাজচিন্তা ও শিল্পমানসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক বলেছেন :

"এই বই এক শিকড়সন্ধান। সন্ধান বলে এই বইয়ে আছে এক অভিযানের উল্লাস।" [৭]

---

৬. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কথা ও কবিতা, ১৯৮১, মুক্তধারা, ঢাকা ; পৃ. ৯২

৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, ১৯৮৩, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর ঢাকা ; পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

'বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সমালোচনা গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সমালোচনার সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ দেশের খ্যাতনামা বার জন (কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক) লেখকের সাহিত্য-ভাবনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। যেমন- 'মোহিতলাল মজুমদার : কবি', "জীবনানন্দ দাশের 'কবি' কবিতা পর্যায়", 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি', 'ফররুখ আহমদ : রূপকল্প ও ছন্দ' প্রভৃতি। তৃতীয় অধ্যায়ে "জগদীশ গুপ্তের 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী" "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ", "জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গন্ধ", "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'না কান্দে বুবু" এ চারটি বিখ্যাত গল্পের উপর আলোচনা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বার জন বিখ্যাত কবির বিখ্যাত কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন- 'তোমার সৃষ্টির পথ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'রৌদ্র-দগ্ধের গান : নজরুল ইসলাম', 'দামিনী : বিষ্ণু দে' প্রভৃতি। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে চার উপন্যাসের পুনর্মূল্যায়ন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন লেখকের বত্রিশটি গ্রন্থ সমালোচনা ও মূল্যায়ন। 'বিবেচনা - পুনর্বিবেচনা' গ্রন্থটি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৪৪-) তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'কালের যাত্রার ধ্বনি' (১৯৮৯), 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন', 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য' (১৯৮৮), 'মুক্তি সংগ্রাম', 'নবযুগের প্রত্যাশায়' (১৯৯৪), 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' (১৯৯৭) প্রভৃতি গ্রন্থে ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ধারায় জীবন ও সমাজের স্বরূপ উন্মোচনে লেখক আন্তরিক প্রয়াস পেয়েছে। 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য' (১৯৮৮) গ্রন্থে বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, বাঙলা সাহিত্যের রূপান্তর : মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ, সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর : সামন্ত শ্রেণীর অবক্ষয় ও মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয়, মধ্যশ্রেণীর জীবনভাবনা ও আধুনিক বাঙালা সাহিত্য এবং নবযুগের প্রত্যাশা প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। 'সমাজব্যবস্থার রূপান্তর : সামন্ত শ্রেণীর অবক্ষয়' অংশে লেখক ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ সাপেক্ষে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। সমাজ- মানুষের শ্রেণিভেদ এবং সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের দিক ও কারণগুলো এ অংশে লেখক ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছন। তৎকালীন সামাজিক বিরোধকে শনাক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> "অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত ক্ষেত্রে সামন্ত শাসক-শোষক-ধর্মপতি-সমাজপতিদের সঙ্গে অনভিজ্ঞাত কৃষক-জনতার খণ্ড-বিচ্ছিন্ন, অচেতন শ্রেণী সংগ্রামই ছিল সে-কালের সামাজিক বিরোধের প্রধান রূপ।" [৮]

এ সামাজিক বিরোধ থেকেই আসে সমাজ পরিবর্তন এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কিংবা ঐক্যবদ্ধতা। 'বাঙলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' গ্রন্থে লেখক অতি গুরুত্বপূর্ণ ১৬টি প্রবন্ধ সংকলিত করেছেন যা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে নতুন সংযোজন। হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪): তিনি একাধারে ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্য-গবেষক ও সমালোচক। 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা' (১৯৭৩), 'শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা' (১৯৮৩), 'ভাষাতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব' (১৯৮৪), 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' (১৯৮৭), 'শিল্পকলার বিমানবিকীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮৮), 'তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান' (১৯৮৮), 'সীমাবদ্ধতার সূত্র' (১৯৯৩), প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধসংকলন। 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' গ্রন্থে মোট ২৩টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অনেক প্রবন্ধের নামকরণ থেকে বোঝা যায় না যে, প্রবন্ধগুলোতে বাংলা ভাষার কত বেশি গভীর বিশ্লেষণ রয়েছে। 'জন্মকথা', 'আদি-মধ্য-আধুনিক : বাঙলা জীবনের তিন কাল', 'ধ্বনিবদলের কথা', 'ধ্বনি পরিবর্তন : শব্দের রূপবদল', 'ভিন্ন ভাষার শব্দ' প্রভৃতি এ গ্রন্থের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। 'সীমাবদ্ধতার সূত্র' গ্রন্থে বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গত দু-শো বছরের সৃষ্টিশীলতা ও বিশ্লেষণশীলতার সীমাবদ্ধতার কারণ ও স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "বাঙালির গত দু-শো বছরের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের ইতিহাস হচ্ছে সীমাবদ্ধতা ও অনুকরণের ইতিহাস।" [৯]

বাঙালি পশ্চিমের লেখকদের কাছ থেকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল আয়ত্ত করেছেন বলে গ্রন্থকার মনে করেন। এ গ্রন্থে একটি তাত্ত্বিক ও দশটি সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁর মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে। 'বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়' (১৯৯৭) গ্রন্থটি কবিতা, উপন্যাস, গল্প, কিশোরসাহিত্য ও প্রবন্ধের সংকলন। এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশটি

---

৮. আবুল কাসেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য, ১৯৮৮, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার লেন, ঢাকা ; পৃ. ৩৫

৯. হুমায়ুন আজাদ, সীমাবদ্ধতার সূত্র, ১৯৯৩,আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ; পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলো হচ্ছে 'বাঙলা ভাষাতত্ত্ব', 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রীয়াশীলতার বিষবৃক্ষ', 'শিল্পকলার মানবিকীকরণ', 'মধ্যাহ্নের অলস গায়ক : রোম্যান্টিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ', 'বিশ্বাসের জগত', 'শহীদ মিনার : কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু'। 'শহীদ মিনার : কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু' প্রবন্ধে লেখক ১৯৫২ সনের মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে শহীদদের রক্তঝরা করুণ ইতিহাস তুলে ধরেছেন কাব্যিক ভাষায়। তিনি এ প্রবন্ধে বলেছেন :

> "মহাকালের বিরুদ্ধে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অশ্রু আর রক্ত। শিশিরের মতো ক্ষণায়ু তারা কিন্তু মন চায় তাদের চিরায়ু দিতে।" [১০]

কিন্তু তাতো মানুষের পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয়। প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদ তিনি বলেছেন,

> "সংখ্যাহীন শহীদদের মাংস মিশে গেছে বাংলার মাটিতে, নাম মুছে গেছে অসংখ্য সম্ভাব্য শহীদের। মুছে যাবে আরো অসংখ্য সম্ভাব্য শহীদের নাম, পরিচয় ; অন্ধকারের শক্তিরা যতোদিন থাকবে।" [১১]

পরাশক্তির ছত্রছায়ে দেশীয় অপশক্তি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন শহীদদের সঠিক মূল্যায়ন ব্যাহত হবে। 'শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮৮) গ্রন্থে মোট আটটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'মধ্যাহ্নের অলস গায়ক : রোমান্টিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ', 'জসীম উদ্‌দীনের কবিতা : রচনাকৌশল ও শাব্দ অবয়ব', 'কবিতা কি ও কেনো', 'ভাষা-আন্দোলন-পূর্ব (১৯৪৭-১৯৫২) কবিতার শৈল্পিক ও সামাজিক চারিত্র', 'প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচিত। 'কবিতা কি ও কেনো' প্রবন্ধে লেখক কবিতার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেছেন :

> "কবিতা উৎকৃষ্টতম শব্দের উৎকৃষ্টতম বিন্যাস ; কবিতা আবেগের প্রশান্ত পুনশ্চয়ন ; বলতে পারি কবিতা অবিস্মরণীয় বাণী। বা উদ্ধৃতি করতে পারি জীবনানন্দীয় রহস্যোক্তি যে 'কবিতা ও জীবন, একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ।" [১২]

মানবসমাজের কবিতার ভূমিকা সম্পর্কেও লেখক এ প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত পাকিস্তান আমলে প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করলেও ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ সমাজ-রাজনীতি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রবন্ধ রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতে চলে যান। রণেশ দাশগুপ্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তাপ, সংঘাত ও সমন্বয় সম্পর্কে কখনও উদাসীন ছিলেন না। কলকাতায় বসে লেখা তাঁর রচনায়ও প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের উত্তপ্ত সমকালের। তাঁর সাহিত্য ও শিল্পভাবনাও এ তাপ সঞ্চয় করে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

---

১০. হুমায়ুন আজাদ, বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়, ১৯৯৭, আগামী প্রকাশনী, প্রাগুক্ত ; পৃ. ২১৭

১১. হুমায়ুন আজাদ, প্রাগুক্ত ; পৃ. ২২২

১২. হুমায়ুন আজাদ, শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ১৯৮৮, ইউনিভার্সিটি প্রেস, লিমিটেড, ঢাকা ; পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধে বিষয়বৈচিত্র্য

রণেশ দাশগুপ্ত মূলত প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধ বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশে যখন প্রবন্ধসাহিত্য ঋদ্ধ কিন্তু সীমিত সাহিত্যিকধারা হিসেবে বিবেচিত, তখন তিনি বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে। বিশেষ করে সমাজ, রাজনীতি, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, গণচিন্তা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, শিল্পচিন্তা, সাহিত্য, বিবিধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। আমরা রণেশ দাশগুপ্তের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে যেসব প্রবন্ধের তালিকা পাই তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবন্ধ রয়েছে অগ্রন্থিত আকারে। তাঁর অগ্রন্থিত বহু প্রবন্ধ আমরা পাঠ করেছি। গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমূহের আলোকে বিচিত্র বিষয়ের সম্ভার তাঁর সৃষ্টিতে লক্ষ করা যাবে। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে সাহিত্য-শিল্পভাবনার স্বরূপ অনুসন্ধান আমাদের প্রধান বিবেচনা। তাঁর প্রবন্ধে এই বিষয়ের বাইরে আর যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তন্মধ্যে নিচে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. সমাজভাবনা
২. রাজনীতিচেতনা
৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতিভাবনা
৪. গণচিন্তা
৫. চলচ্চিত্র-বিবেচনা
৬. চিন্তার বহুমুখী প্রক্ষেপণ।

সমাজভাবনা

সমাজভাবনা রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে বড় হয়ে ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি তাঁর সমাজভাবনার প্রধান বিষয়। সমাজ-মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের মধ্যে তাঁর সমাজভাবনার নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত। তিনি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সাধনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মার্কসীয় জীবনদর্শনকেই তিনি সমাজকল্যাণের সবচেয়ে বেশি উপযোগী বলে মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে মার্কসীয় তত্ত্বাদর্শন সকল সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির

Dhaka University Institutional Repository

উর্ধ্বে। মার্কসীয় তত্ত্বালোকে রচিত তাঁর সমাজভাবনা বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা বেশি। রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস ও নাটকবিষয়ক প্রায় সব প্রবন্ধেই সমাজভাবনা যুক্ত হয়েছে। 'শরৎ-জিজ্ঞাসার সূত্র' প্রবন্ধে শরৎ-সাহিত্য বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধকার সমাজ বাস্তবতা, শ্রেণিসংগ্রাম ও নিচতলার মানুষের জীবনচিত্র উপস্থাপিত করেছেন। নিম্নে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

> "শরৎচন্দ্র নরনারী ও তাদের বাঙ্ময় সংসার সমাজ বা পৃথিবী ও দেশের সামগ্রিক বাস্তববাদী উপন্যাস লিখেছেন।--- তিনি বাঙালি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একেবারে সমাজের নিচতলাগুলোতে বসে তাঁর চিন্তার বৃত্তের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন।" [১]

এখানে শরৎচন্দ্রের সমাজ নিয়ে কাজ করার ইঙ্গিত রয়েছে। সমাজ-মানুষের সঙ্গে এক সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন এ কথা সাহিত্যিক। সমাজ ও জীবন তাঁর রচনায় অবিচ্ছেদ্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী জীবনকে তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন। তিনি ছিলেন কমিউনিস্টপন্থী। কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় :

> "এরা প্রত্যেকেই জনগণের মুক্তিসংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গিত করে প্রায় একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানত সংগ্রামী খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলেছেন অতি আধুনিক রীতিতে। সামান্য ও অসামান্য নির্বিশেষে এবং বিশেষ করে সামান্য ও অসামান্য মেহনতী মানব-মানবীদের নিমগ্ন মনের সম্ভাবনা, যন্ত্রণা, আনন্দ, মাধুর্য এবং বৈপ্লবিক ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করাই এঁদের অতি আধুনিকতার রীতি।" [২]

রণেশ দাশগুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সাহিত্য বিশ্লেষণ করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে পৌঁছার লক্ষ্যে মেহনতি মানুষের সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন তাঁর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে।

বিদ্যাসাগরের সৃষ্টিশীল, মানবতাবাদী, সমাজকল্যাণমূলক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে 'বিদ্যাসাগর : আধুনিক বিদ্রোহী রূপরঙ্গী' প্রবন্ধে। বিদ্যাসাগর যথার্থ অর্থেই একজন সমাজসংস্কারক ও নির্মাতা তার পরিচয় পাওয়া যায় রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে :

---

১. রণেশ দাশগুপ্ত, আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (প্রবন্ধ : শরৎ জিজ্ঞাসার সূত্র), ১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ; পৃ. ১৪৬ ও ১৪৭

২. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, (প্রবন্ধ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ; পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

> "বিদ্যাসাগর --- সমাজসংস্কারক ও নির্মাতারূপে সেই সময়ে কলকাতা ও বঙ্গসমাজে বিরাজ করছিলেন। তাঁর নারী সমাজের প্রতি শ্রদ্ধার কিংবা নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলনের কার্যক্রমের মধ্যে আধুনিকতাপন্থী মানবিক নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির নারীহৃদয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ফল্গুধারার মতো বয়ে যাচ্ছিল। তিনি দাবীদারও ছিলেন না মৌলিক রূপ ও রসসৃষ্টির। তাছাড়া বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সেই সময়ের বঙ্গ সমাজে বিদ্রোহী উদ্যোগ ও অবস্থান তাঁকে সামাজিক জীবনধারায় বিতর্কের কেন্দ্র রূপে স্থাপন করেছিল।" [৩]

বঙ্কিমের সমাজভাবনার প্রাবল্যের দিকটি রণেশ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেছেন। সমাজের অমানবিক, নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম করে গেছেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । সমাজ-মানুষের অস্থির চিত্তচাঞ্চল্যের যবনিকা ঘটিয়ে শান্তিময় নতুন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টিই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

'স্বামী বিবেকানন্দ : সহযাত্রী সাম্যবাদী' প্রবন্ধে সমাজের দরিদ্র, শ্রমজীবী, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের উত্থানের লক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী কার্যক্রমকে বহু তথ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে উপস্থাপিত করেছেন প্রবন্ধকার। স্বামী বিবেকানন্দের লেখায় পাওয়া যায় -

> "বিশ্ব ও স্বদেশের সমাজের দরিদ্র, অবনত ও শোষিত শ্রমজীবী সর্বসাধারণের এবং বিশেষ করে বঞ্চিত ও নিপীড়িত নারীসমাজের বিপ্লবী উত্থানের ও আয়োজনের সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী প্রকল্পকে।" [৪]

স্বদেশ ও সমাজভাবনা স্বামী বিবেকানন্দের অনেক প্রবন্ধেই লক্ষ করা যায়। রণেশ দাশগুপ্ত সাম্যবাদের দৃষ্টিতে তাঁর প্রবন্ধের সমাজভাবনাগুলোকে শনাক্ত করেছেন।

---

৩. রণেশ দাশগুপ্ত, সাম্যবাদী উত্থান-প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা (প্রবন্ধ- বিদ্যাসাগর : আধুনিক বিদ্রোহী রূপরঙ্গী), ১৯৯৪, উত্থক প্রকাশনী, ৪০ ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা ; পৃ. ৩

৪. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, (প্রবন্ধ- স্বামী বিবেকানন্দ : সহযাত্রী সাম্যবাদী) ; পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিচেতনা

রণেশ দাশগুপ্ত একজন সচেতন কমিউনিস্ট-কর্মী ছিলেন। সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠাই কমিউনিস্টদের একমাত্র ব্রত। তাই যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি মার্কসবাদী ভাবাদর্শকে তাঁর জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ থেকে শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার মূলোৎপাটন করে তিনি বিশ্বময় চিরশান্তির আবাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মার্কসীয় দর্শনই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তি। এ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্যের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। তাঁর রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিসংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনলব্ধ শক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ সম্পর্কে আমরা আজও পুরোপরি সচেতন হতে পেরেছি কিনা এ ব্যাপারে লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। নিজের মনের প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করেছেন 'নিজের মনের কাছে প্রশ্ন' প্রবন্ধে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

> "প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক মুক্তিসংগ্রামের কর্মসূচীকে যাচাই করার যে রেওয়াজ গড়ে উঠেছে।' তাঁর মূলে রয়েছে ভাষা আন্দোলনের এই সম্ভাবনাকর বহুমুখিতা। জীবনকে সামাজিক দিক দিয়ে সার্থক করে তোলার জন্য এ ধরণের কেন্দ্রভূত তাগিদ আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া অন্যান্য অনেক দেশ তৈরী হয়ে উঠেনি। এদিক দিয়ে ঠিকই আমরা এগিয়ে এসেছি ইতিহাসের ধারায়। কিন্তু প্রশ্ন এটি যে, এই আন্দোলনলব্ধ শক্তি সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি সচেতন হতে পেরেছি কি আজও ?" [৫]

রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এ বিশ্বাস রণেশ দাশগুপ্তের মধ্যে ছিল।

---

৫. মোঃ মহসীন ভূঁইয়া (সম্পাদক), ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : 'নিজের মনের কাছে প্রশ্ন'), ১৩৭৬, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা ; পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য সংগ্রামী জনতা তাদের বুকের যে পরিমাণ রক্ত খরচ করেছেন তার বদৌলতে সংগ্রামী জনতার কি পরিমাণ প্রাপ্তি ঘটেছে সে বিষয়ে প্রবন্ধকার 'সংগ্রামী জীবনের জমা খরচের খাতায়' প্রবন্ধে গভীর দৃষ্টিপাত করেছেন। এ প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ :

> "যারা ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, তাঁদের রক্ত রেখেছি খরচের খাতায়। জনতার বুকের রক্তধারার নামেই এই খরচ, কারণ শেষ পর্যন্ত নাম জনতারই নামে। অনামীদের নাম জনতা। সংগ্রামীর নাম অবশ্য ওঠে জমার খাতায়, কারণ জনতা কখনও খরচ হয় না, জনতা অফুরন্ত। রক্ত খরচটা অবশ্য জনতার কাছে আজও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। --- খরচের তুলনায় জমার খাতায় এখনও আসল হিসাব উঠতে বাকী।" [৬]

প্রবন্ধকার যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো, সংগ্রামে যে পরিমাণ রক্ত ঝরেছে সে তুলনায় সংগ্রামী জনতার জন্ম হয়নি। এখনও প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিবাদী কণ্ঠ জন্মাতে পারেনি।

ভাষা আন্দোলনই আমাদের গণতান্ত্রিক মুক্তির আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন বলে প্রবন্ধকার মনে করেছেন। গণতান্ত্রিক মুক্তির ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকাকে লেখক তাঁর 'ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত' প্রবন্ধে গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকে জানা যায় :

> "গত আঠারো বছরের পতন, অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ধ্রুবতারার মতো পথ দেখিয়েছে। ভবিষ্যতেও একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ধ্রুবতারা থাকবে। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যতো গভীরে যাবে, যতো বিস্তৃত হবে, এর সার্থকতা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে পথের দিশারী একুশে ফেব্রুয়ারি।" [৭]

গণতান্ত্রিক মুক্তির আন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারি পথের দিশারীর ভূমিকা পালন করেছে। এ পথ বেয়েই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন স্বাধীনতাকে অর্জন করেছি।

---

৬. আসাদুজ্জামান নূর (সম্পাদক), বিদ্রোহী বর্ণমালা (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : সংগ্রামী জীবনের জমা-খরচের খাতায়), ১৯৭০, (প্রকাশনার নাম উল্লেখ নেই) ; পৃ. ৫০

৭. অধ্যাপক মোজাম্মেল হক (সম্পাদক), স্বাক্ষর (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত), ১৯৭০, তরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংসদ, বগুড়া ; পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে গণমুক্তির সংগ্রাম করতে যেয়ে যে একাধিক দল ও মতের সৃষ্টি হয়, তাতে এক সংকট কাটিয়ে আরেক সংকটের শুরু হয়। প্রগতিশীল দলসমূহ যাতে একই স্রোতের খাতে প্রবাহিত হয় তার সুযোগ তৈরী করে দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক বলে প্রবন্ধকার 'একই স্রোতের খাতে' প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। লেখকের এ অভিমত তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে :

> "*গণমুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ধারাকে একই স্রোতে কিভাবে নিয়ে গেলে আমরা সফল হবো। সে* প্রশ্ন এসেছে আরেকটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। সেটা হচ্ছে এই যে, একই খাতে গণমুক্তি সংগ্রামকে রাখার জন্য এবং এই ঐক্য হারা প্রতিক্রিয়ার সমস্ত শক্তিকে তৃণখণ্ডের মতো ভাসিয়ে দেবার জন্যে যে সব নিম্নতম কর্মসূচী গত দুই দশকে বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলিকে নিয়ে জনগণের পক্ষের সংগ্রামী দলগুলি শেষ পর্যন্ত চলতে পারেনি। --- এ অবস্থায় যাঁরা এখনও নিম্নতম কর্মসূচী এবং একই স্রোতের খাতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কথা বলেছেন, তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, তাঁরা অযাচিতভাবে ঐক্যের প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছেন।" [৮]

প্রগতিশীল দলসমূহের ঐক্যমত জনজীবনে আশার আলো সৃষ্টি করতে পারে। তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে উক্ত প্রবন্ধে।

বাংলা ভাষা আন্দোলনকে প্রবন্ধকার গণমুক্তি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র বলে মনে করেন। বাংলা ভাষা ঐশ্বর্যশালী, এ ভাষার শক্তি অমিত। এ ভাষার বদৌলতে বাঙালি বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পেয়েছে। প্রবন্ধকার এ ভাষার যথার্থ মর্যাদা দাবি করেছেন। এমনি ধারণা ব্যক্ত হয়েছে রণেশ দাশগুপ্তের 'গণমুক্তি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র' ও 'ভাষা আন্দোলনের একটি মূল তাৎপর্য' প্রবন্ধে। লেখক 'গণমুক্তি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র' প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করেছেন এভাবে।

> "বাংলা ভাষা আন্দোলনকে আমাদের গণমুক্তি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র বলা যেতে পারে। স্নায়ুকেন্দ্রের দরুণই আমরা বার বার ভুল করলেও হিসাবটাকে আবার সঠিক করে নিতে পেরেছি। নানাদিক দিয়ে দারিদ্র্য সত্ত্বেও আমরা পেয়েছি একটা অক্ষয় শক্তি উৎসকে।" [৯]

ভাষা আন্দোলনের অপরিসীম শক্তিকে প্রবন্ধকার গুরুত্বের সংগে বিশ্লেষণ করেছেন উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে।

---

৮. (সম্পাদকের নাম উল্লেখ নেই), ইশতেহার (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : একই স্রোতের খাতে), ১৯৭১, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা ; পৃ. ১০ ও ১১

৯. ডালিয়া সালাহ্উদ্দিন (সম্পাদক), এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : গণমুক্তি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র), ১৯৭১, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখা ; পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

'একটা আরশিকে নিয়ে' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্তের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। ধারণাটি হলো - আরশিতে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে দেখতে চাইলে যেমন ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আলো ফেলতে হয় তেমনি একটা বিপ্লব দেখতে চাইলেও প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন দর্শনের।

'জনতার সংগ্রাম' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।

> "নরঘাতক ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, হামিদ খান গণ্ডের নির্দেশে হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে ঠাণ্ডা করার মতলবে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড আর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে গত সাত মাস ধরে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই।" [১০]

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার কর্তৃক বাংলার মানুষ কিভাবে নির্যাতিত ও নিহত হয়েছে তার এক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এ প্রবন্ধটি।

'ফরাসী মহাবিপ্লব : মার্কসীয় নিরিখের পরতে পরতে' প্রবন্ধে মার্কসীয় চেতনার নিরিখে ফরাসী মহাবিপ্লবের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তৎকালীন বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের স্বৈরশাসকের গুণ্ডাবাহিনী কিভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল এবং এ পার্টি কখন কিভাবে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে তার একটা সমীক্ষা করেছেন প্রবন্ধকার 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি : একটি আত্মসমীক্ষা' প্রবন্ধে। লেখক বলেছেন :

> "৪৮ সাল থেকে ৫৩ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি খোলাখুলিভাবে দফতর নিয়ে বাংলাদেশের কোথাও কাজ করার কথা ভাবতে পারেনি। এখানে ৫৩ সালের উল্লেখের একটা অর্থ রয়েছে সেটা বলা দরকার। বস্তুত, ৫৩ সালের মাঝামাঝি থেকে ৫৪ সালের এপ্রিল মাসে সরকারীভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী পর্যন্ত সময়টা ছিল ব্যতিক্রম। '৫৪ সালে বাংলাদেশে যে 'প্রাদেশিক নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয় তার প্রস্তুতিপর্বে ৫৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য সরকারবিরোধী দলের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিও কিছুটা খোলাখুলি কাজ করার পথ পায় এবং সেটা কাজে লাগায়।' [১১]

১০. মতিউর রহমান (সম্পাদক), একতা (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : জনতার সংগ্রাম), বর্ষ-১৫,সং-৫০, ১৯৮৬, ঢাকা ; পৃ. ৫

১১. নরহরি কবিরাজ (সম্পাদক), মূল্যায়ন (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ - বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি : একটি আত্মসমীক্ষা), ৭ম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৮, কলকাতা ; পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে প্রবন্ধকারের এ বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধে।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের মহান শহীদ ভগৎ সিংহ, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর, সুখদেব এবং তাঁদের পতাকাবাহী শহীদ নারায়ণদাস -এর সংগ্রামী জীবনালেখ্য বর্ণিত হয়েছে লেখকের 'অগ্নিযুগের আলেখ্য : সাম্প্রতিক প্রশ্নে' প্রবন্ধে।

আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তিসংগ্রামে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী মানুষের প্রেরণার উৎস বিপ্লবী কবিতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার তাঁর 'আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে। এ মহাদেশে বিশেষ করে বিপ্লবী কবিতার মাধ্যমে লেখক সাহিত্যের মূল ধারাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এ প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:

> " মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সূত্রে সদ্য স্বাধীন অথবা স্বাধীনতার তোরণে উপনীত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কবিতা, ছোটগল্প, নিবন্ধ, নাটক পাওয়া যায় একটি সাজিতে। বিশ্লেষণের চেষ্টাও করা যায় এদের ধারা সম্পর্কে। যেহেতু এই সাজিতে কবিতাই বেশি পাওয়া যায় এবং প্রায় সকল ভাষা-ভাষী সকল দেশেই পাওয়া যায়, সেজন্য কিছু কবিতা বেছে নিয়েই আফ্রিকা মহাদেশের সাহিত্যের মূলধারাকে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।" [১২]

প্রকৃত পক্ষে, আফ্রিকার বিপ্লবী কবিতা বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধকার আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

লেনিন বিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথিবৃৎ। আদিকালের সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষই ছিল সংস্কৃতির মূল আধার। সভ্যতা বিকাশের ক্রমিক বিবর্তনে সমাজের শোষক শ্রেণিই হয়ে ওঠে সংস্কৃতির ধারক ও রক্ষক। কিন্তু লেনিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে শ্রমজীবী মানুষই সংস্কৃতির নিয়ন্তা হয়ে উঠেন। লেনিনের এ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিষয়টিই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লেনিন' প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি :

> 'মানবসমাজের আদিকালে মেহনতী মানুষই ছিল সংস্কৃতির মূলাধার। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণীসমাজের পত্তন হয়েছিল, তার ফলে মেহনতী মানুষের চুম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তে শোষক শ্রেণীর চুম্বকক্ষেত্রই হয়েছিল সংস্কৃতির নিয়ন্তা। ইতিহাসের ধারায় বার বার নিপীড়িত

---

১২. রুশ-ভারতী (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও সাহিত্য), বর্ষ-১৭, সং-৪, ১৯৭৮, কলকাতা ; পৃ. ২ ও ৩

Dhaka University Institutional Repository

> মেহনতি মানুষ বিদ্রোহ করে এই চুম্বকক্ষেত্রকে ভেঙ্গে নিজেদের চুম্বকক্ষেত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছে কিন্তু শ্রেণী-সমাজ বজায় থাকার দরুণ এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে শ্রেণীসমাজের উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন-সমাজের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তাতে মেহনতি মানুষের চুম্বকক্ষেত্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।' [১৩]

মানব গোষ্ঠীর সংস্কৃতির রূপান্তর ও ধারা পরিবর্তনে লেনিন মেহনতি মানুষকে সামনে তুলে ধরেছেন। এটাই তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

'লেনিন, গোর্কি, গ্রামসি' প্রবন্ধে লেখক যে ধারণাটির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো, সংগ্রামী মানুষই সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক বা মানসিক মুক্তি ঘটাতে পারে এবং যা কিছু সত্য ও সুন্দর তাকে রক্ষা ও অনুসরণ করা উচিত বলে লেনিন যেমন মনে করতেন তেমনি গোর্কি ও গ্রামসি তা বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য :

> "মার্কসপন্থী হিসেবে লেনিন একথা বিশ্বাস করতেন যে, সমাজবিপ্লব ঘটাতে হলে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আমূল বদলে দিতে হবে এবং পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশ ও মুক্তিই মানুষের আত্মিক তথা মানসিক বিকাশকে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করবে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কসপন্থী হিসেবেই সবসময় একথা মনে রাখতে হবে, 'মানুষই মুক্তি বা পরিবর্তন ঘটাবার নায়ক।' এই কারণেই আত্মিক বা মানসিক প্রস্তুতির ওপর লেনিন চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। --- 'সুন্দর যা তা' যদি পুরনো হয়, তবুও তাকে বাঁচাতে হবে, তাকে অনুসরণ করতে হবে।" [১৪]

প্রবন্ধকার সমাজ পরিবর্তনে মানবশক্তিকে যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি সমাজের শান্তি রক্ষায় চির-সুন্দরকে অনুসরণ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মানুষ সুন্দরের পূজারী। তাই সমাজে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।

'শেখ সাদী যাঁকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারতেন' প্রবন্ধে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ড. তকী ইরানীর সংগ্রামী জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন প্রবন্ধকার। তাঁর ধারণা ইরানী কবি শেখ সাদী যদি ড. তকী ইরানীর সমসাময়িক হতেন তা হলে হয়তো তাঁকে নিয়ে গদ্যকাব্য রচনা করতে পারতেন।

---

১৩. রণেশ দাশগুপ্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লেনিন), ১৯৭৫, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১২ মণিহারি পট্টি, ঢাকা ; পৃ. ১৪৮

১৪. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : লেনিন, গোর্কি, গ্রামসি) ; পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

'দস্তয়েভস্কি : দিন বদলের পালায়' প্রবন্ধে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিন বদলের পালায় একদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদী-সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

'প্রবীণ ও নবীন দুই মহাবিদ্রোহী সহযোগী' প্রবন্ধে প্রবীণ ও নবীন মহাবিদ্রোহী বলতে প্রবন্ধকার ফ্রান্সের রোঁমা রঁলা (১৮৬৬ - ১৯৪৪) এবং জার্মানীর আর্নেস্ট টলার (১৮৯৩ - ১৯৩৯) কে বুঝিয়েছেন। এ প্রবন্ধে সমাজতন্ত্র জাতীয় মুক্তি, শান্তি ও বর্ণগত সমস্যা নিরসনকল্পে এ দুজন বিপ্লবী জীবনশিল্পীর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

'মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্ত্বা' প্রবন্ধে লেখক স্মৃতিচারণের আঙ্গিকে মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে এবং বিপ্লবীদের পরস্পরের হাতে হাত রেখে দুর্গম পথে অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে শেখার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশে মুনীর চৌধুরীকে প্রবন্ধকার যেভাবে দেখেছেন :

> "তখন সেই যুগ চলছে যার কবি সুকান্ত। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিভেদকে অতিক্রম করার নিশানা লাল নিশান। তবে ঢাকায় আমরা যে সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুতরাং আমাদের লাল নিশানের রাজনীতি ছিল এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাজনীতি। আর মুনীর চৌধুরী এই সংগ্রামের রাজনীতিতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে শরীক হয়েছিলেন তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক অসাম্প্রদায়িকতার প্রবণতা নিয়ে।" [১৫]

অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা মুনীর চৌধুরীর মনে সদা জাগ্রত ছিল। এ অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা তাঁর সাহিত্য-কর্মে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র।

শহীদুল্লা কায়সারের বিপ্লবী সাহিত্য ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে তাঁর 'শহীদুল্লা কায়সার - কত বিদ্রোহ অগ্নিশিখা' প্রবন্ধে। শহীদুল্লা কায়সারের রাজনৈতিক বিপ্লবীসত্তা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধেও অবাক পৃথিবীকে আবারও অবাক করে 'এত বিদ্রোহ' অগ্নিশিখার ঘটনা ঘটেছে নতুন রূপে। এই বিদ্রোহের আলেখ্য রচয়িতা লেখক, লেখিকা, কবি, শিল্পী যাঁরা, তাঁদের একজন শহীদুল্লা কায়সার।" [১৬]

কৈশোর থেকেই তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রগতিবাদী চিন্তা ও কর্মের অনুসারী।

---

১৫. রণেশ দাশগুপ্ত, আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (প্রবন্ধ : মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা), প্রাগুক্ত ; পৃ. ২১২

১৬. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : শহীদুল্লা কায়সার - কত বিদ্রোহ অগ্নিশিখা) ; পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলো ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সংগ্রামের স্বরূপ, শাসকচক্রের চরিত্র শনাক্তকরণ ও সংগ্রামের অনুষঙ্গগুলো নির্ণয় করেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রসমাজ ও কৃষক-শ্রমিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'শ্রেণীদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিন্তভূমি' প্রবন্ধে। স্বাধীনতা এবং শোষণমুক্ত আজকের বাংলা ; ছাত্রসমাজ ও কৃষক-শ্রমিকশ্রেণি উভয়ের সংগ্রামের ফসল বলে প্রবন্ধকার বিশ্বাস করেন। কোন শ্রেণির একক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। এ প্রসঙ্গে লেখকের প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে :

> "প্রগতিবাদী প্রত্যেকটি ছাত্রদলের মধ্যে একটা শ্রমিকমুখী ও কৃষকমুখী প্রবণতা কম-বেশি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, ছাত্রসমাজের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক সংযোগ স্থাপনের একটা সূত্র স্থাপিত হয়েছে। গত দুই দশকের প্রথম দশকে যত ছাত্র শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে বিপ্লবী সংগঠক হিসেবে কাজে নেমেছিল, তার তুলনায় এবারকার দশকের ছাত্রসমাজের মধ্য থেকে বিপ্লবী সংগঠক বেরিয়ে এসেছে তুলনামূলকভাবে বেশি। --- স্বাধীন শোষণমুক্ত বাঙলা ছাত্রসমাজ এবং মেহনতী মানুষের উভয়েরই চিন্তা-চেতনার ফসল।" [১৭]

ছাত্রসমাজ, শ্রমিক-কৃষকসহ সকল মুক্তিকামী মানুষেরই চেষ্টার ফসল আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা। মূলত বাংলার সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বাঙালিমনে কতটুকু ছায়া ফেলেছিল তার একটা পরিসংখ্যান প্রবন্ধকার ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত দুপর্বে ভাগ করে তুলে ধরেছেন তাঁর 'দুই পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ' প্রবন্ধে।

'স্বাধীনতা দিবসে হিসাবের খাতায় জমা বিপ্লব' প্রবন্ধের বক্তব্য 'সংগ্রামী জীবনের জমা খরচের খাতায়' প্রবন্ধের কাছাকাছি। এ প্রবন্ধদ্বয়ে স্বাধীনতা দিবসের হিসাবের খাতায় জমা বলতে গণবিপ্লবকে বুঝিয়েছেন এবং সংগ্রামীর বুক থেকে ঝরে যাওয়া রক্তকে খরচ মনে করা হয়েছে।

---

১৭. রণেশ দাশগুপ্ত, মুক্তিধারা (প্রবন্ধ : শ্রেণীদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিন্তভূমি), ১৯৮৯, জ্ঞান প্রকাশনী, ১৫ লারমিনি স্ট্রিট, ঢাকা ; পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালের ২৪ শে এপ্রিলে রাজশাহী কারাগারে মার্কস-লেনিনবাদী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগ্রামী ও বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারক যে সাত জন বন্দিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তাঁদের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে '২৪ শে এপ্রিলের শহীদদের স্মরণে' প্রবন্ধে।

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ কোন একটি মানুষের মুক্তির জন্যে নয় বরং সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্যে। মুক্তিকামী এ মানব-মানবীকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের শরীক করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ সাম্যবাদী বিপ্লবীদের স্বস্তি নেই। এমনি এক দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে 'সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রশ্নে' প্রবন্ধে।

পুঁজিবাদী বিশ্বের অবস্থা সামলাতে যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন পুঁজিপতিগোষ্ঠী জনগণকে বিভ্রান্ত ও দিকভ্রান্ত করার কাজে লিপ্ত। সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান চালানোর জন্যে মার্কসবাদীরা প্রস্তুত না অপ্রস্তুত এ ব্যাপারে প্রবন্ধকার 'মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত' প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধকার একান্তই বিশ্বাস করেন যে, সাম্রাজ্যবাদের যে কোন হামলার বিরুদ্ধে মার্কসবাদী শক্তি সদা প্রস্তুত। লেখকের প্রবন্ধে উল্লেখ আছে :

> "মার্কসবাদের মূল চিন্তায় খোঁজ চলছে অবিরাম। সারা বিশ্বে কাজ হবেই এই নিয়ে। সমস্ত মূল প্রশ্নেই মার্কসবাদ সাম্রাজ্যবাদের হামলার বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার অভিযান চালাবার জন্য তৈরী।"[১৮]

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ অপ্রস্তুত নয় বরং প্রস্তুত।

মার্কসপন্থী বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ও পরিব্রাজক রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের জীবনাদর্শ ও কর্মকাণ্ডের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে 'রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন জন্মবার্ষিকীতে' এবং 'ভল্গা থেকে গঙ্গা : মহালগ্নের মহাগ্রন্থ' নামক প্রবন্ধদ্বয়ে।

সাম্যবাদ প্রসঙ্গে চিলির জয়-পরাজয়ের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। চিলির উত্থানের সঙ্গে যাতে ইউরোপের বিপর্যয়গ্রস্ত দেশসমূহে সাম্যবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে এ প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে 'সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে।

---

১৮. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মার্কস্‌বাদ কি অপ্রস্তুত) ; পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত বুদ্ধিজীবী ও মেহনতি জনগণের বার বার পিছিয়ে পড়া মুক্তিসংগ্রাম থেকে উত্তরণের জন্যে ফরাসী মনীষী রোঁমা রঁলার ভূমিকা তুলে ধরেছেন। রঁলা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে মশালের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন,

> "এই মশাল সাম্রাজ্যবাদীদের গোটা পরিকল্পনার পক্ষে অসুবিধাজনক, অন্তরায়। এই অসুবিধাজনক মশালটি (Inconvenient torch) নেভানোর জন্যে তো হন্যে হয়ে তারা চেষ্টা করবেই। রঁলা চেয়েছিলেন, এই মশালকে যেন কেউ কখনও নেভাতে না পারে।" [১৯]

এ চেতনাকেই রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর 'এ মশাল নেভে নেভে নেভেনা' প্রবন্ধে আলোচনায় এনেছেন।

হিন্দি উপন্যাস, ছোটগল্প ও নিবন্ধ-সাহিত্যের বিখ্যাত রূপকার যশপাল অতিমাত্রায় রাজনীতিসচেতন ছিলেন। রণেশ দাশগুপ্ত যশপালের জ্বালাময়ী গ্রন্থ 'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি'-এর নিপীড়িত মানুষের চিত্রাঙ্কন করেছেন।

মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে বিভিন্ন জাতি এমন কি উপজাতিদের বিদ্রোহী চেতনাকেও রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর 'আদিবাসী বিদ্রোহের শিল্পরূপ-সন্ধান' প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বীরসারের নেতৃত্বে মণ্ডাদের বিদ্রোহের কাহিনীও তুলে ধরেছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর 'দুই আধুনিক মাতৃতন্ত্রী সাম্যবাদী নাট্যশিল্পী' প্রবন্ধে দুই বাংলার লোকভাষা, লোকচৈতন্য ও লোকশক্তি উত্থানের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী নারীকে পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে বিজন ভট্টাচার্য ও ঋত্বিক ঘটকের অসামান্য অবদানের কথা ব্যক্ত করেছেন।

ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামে গেরিলা গণবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় ভূমিকার পাশাপাশি কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সমান মর্যাদার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক আলেজো কার্পেন্‌টিয়ারের সাহিত্য-ভূমিকা উপস্থাপিত করা হয়েছে 'ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের ঔপন্যাসিক আলেজো কার্পেনটিয়ার' প্রবন্ধে।

রণেশ দাশগুপ্তের রাজনীতি মূলত মার্কসবাদকে ঘিরেই। স্বাদেশিকতা ও নিঃস্ব শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর রাজনীতির মৌল বৈশিষ্ট্য। তাঁর রাজনীতিবিষয়ক সকল প্রবন্ধেই এ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে।

---

১৯. রণেশ দাশগুপ্ত, সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা (প্রবন্ধ : এ মশাল নেভে নেভে নেভেনা), প্রাগুক্ত ; পৃ: ৮২

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও সংস্কৃতিভাবনা

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়েও রণেশ দাশগুপ্তের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'স্বাধীনতার একটি নাম গণমুখী শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হলো – মানুষের মৌলিক অধিকার আদায় ও ভোগের মধ্যে স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে ওঠে। শিক্ষাকে সারাদেশের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়াটা হচ্ছে গণমুখী শিক্ষার ধারা। এটা স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার। গণমুখী শিক্ষা হচ্ছে স্বাধীনতা ; এ স্বাধীনতা হচ্ছে জনগণের আলো ; এ শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে গণবিরোধী শিক্ষা-ব্যবস্থা পরাধীনতার সামিল। এ প্রসঙ্গে লেখক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> "জনগণকে যে মুহূর্তে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া হবে, সে মুহূর্তেই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মাতৃভাষা বাংলা মারফত জনগণ অত্যন্ত সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারবে। স্বাধীনতার পরে আমাদের মাতৃভাষা শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা তাই গণমুখী শিক্ষার মধ্য দিয়ে ফলন্ত হবেই।" [২০]

শিক্ষাক্ষেত্রে গণমুখী ধারা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষায় স্বাধীনতা আনয়ন করা সম্ভব। আমাদের মাতৃভাষা আজ শৃঙ্খলমুক্ত। ফলে গণমুখী শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে মাতৃভাষারও ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

রণেশ দাশগুপ্ত 'মিলিব মিলাবো' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙালি-সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে ভেবেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চিত্রকলা অনেকাংশে বিকশিত হয়েছে এবং তা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছেছে। এভাবে প্রগতিশীল বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদান এবং মিলিয়ে নেবার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন প্রবন্ধকার। একটি জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অন্য জাতির সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে জাতি সুগঠিত হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি :

> "এভাবে দেয়া নেয়ার পালায় আমাদের ভাবগত কৃতির দেয়ার দিকটা দাগ এঁকেছে স্বাতন্ত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে। আমরা তাই আজ বলতে পারি, দিব আর নেব, মিলিব-মিলাবো।" [২১]

---

২০. রণেশ দাশগুপ্ত, স্বাধীনতার একটি নাম গণমুখী শিক্ষা, জাতীয় তরুণ সংঘ সভা, ১৯৭৩, কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংস্কৃতিক বিভাগ, ২১/২২ হাজারীবাগ, ঢাকা ; পৃ. ৪

২১. রনজিৎ কুমার সেন (সম্পাদক), আলপনা (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : মিলিব মিলাবো), ১৯৭৫, ২৫ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা ; পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি-সংস্কৃতিকে কিভাবে আরও সমৃদ্ধশালী করা যায়, এ ব্যাপারেও রণেশ দাশগুপ্ত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক বিশ্বের গ্রহণযোগ্য সাংস্কৃতিক উপাদানকে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রগতিশীল বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতি আরও বিকশিত হবে এ বিশ্বাস শুধুমাত্র রণেশ দাশগুপ্তের নয়, আমাদেরও।

'মেহনতই হচ্ছে সংস্কৃতির মূল উৎস' ম্যাক্সিম গোর্কির এ উক্তিটিকে রণেশ দাশগুপ্তও সমর্থন করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লেনিন' শীর্ষক প্রবন্ধে সংস্কৃতি ভাবনায় মেহনতি মানুষের চেতনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মেহনতি মানুষের সংগ্রামী ভূমিকাকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> "সমাজ-বিপ্লব সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তির পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয় এবং এই বিপ্লবকে ঘটাবার জন্যেও প্রয়োজন পড়ে সংগ্রামী বিপ্লবমুখী সাংস্কৃতিক মানস আন্দোলনের। এই সাংস্কৃতিক মানস ও বিপ্লবের পুরোধা হয় সেই শ্রেণী, যার নেতৃত্বে সমাজের সমস্ত নিপীড়িত মানুষ যুগান্তরের মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে।" [২২]

সংস্কৃতি হবে গণমুখী। তা সকল মেহনতি মানুষের আত্মিক ও মানসিক ক্ষুধা মেটাবে। কারণ মেহনতি মানুষই সংস্কৃতি সৃষ্টির মূলাধার। মেহনতি মানুষের সংগ্রামের ফলে সামাজিক কাঠামোতে ঘটে পরিবর্তন, আর এ পরিবর্তনের ফলে সংস্কৃতিতে আসে বিবর্তন। এ বিবর্তনের ধারাবাহিকতা ধরে জাতীয় সংস্কৃতি অগ্রসর হতে থাকে।

---

২২. রণেশ দাশগুপ্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা, (প্রবন্ধ : সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লেনিন), প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

গণচিন্তা

সাহিত্যে গণমানুষের সম্পর্কে নিয়েও রণেশ দাশগুপ্ত ভেবেছেন। তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধে এ চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। 'শিল্প-সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে জনগণের গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। জনগণ ছাড়া সাহিত্য অচল, মানুষের কীর্তি দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে সাহিত্যে অংকিত হয়। আবার জনগণই হতে পারে জাত শিল্পী। সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা কিরূপ হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য:

> "জনতা হচ্ছে জাত শিল্পী, জন্মশিল্পী । --- আজ সংগ্রামী জাত-শিল্পীদের ডাক দিতে হবে আমাদের সংস্কৃতির অচলাবস্থা যেখানে যেখানে ঘটেছে সেখানে সেখানে অভ্যুদয় ঘটানোর জন্য। একতরফা কিছু করার জন্য নয়, সর্বাত্মক মুক্তির জন্য এই আহ্বান। জনতাকে হতে হবে সচেতন শিল্পদৃষ্টি সম্পন্ন জনতা।" [২৩]

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্ত দুটি ধারার কথা উলেস্নখ করেছেন-লোকায়ত এবং চিরায়ত। এ উভয় ধারাই পরিপুষ্টি লাভ করেছে মূলত লোকসমাজ থেকেই। লোক সমাজ থেকেই আমাদের শিল্প সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

'অদৃশ্য জনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অদৃশ্য জনতার উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন জনগণের অভিমতের প্রয়োজন আছে তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনগণের জীবনাচরণও বড় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন :

> "আধুনিক শিল্পকলা-সাহিত্যের সকল ধারায়, এমন কি ব্যক্তিক প্রাধান্য সমন্বিত ধারাতেও জনতার উপস্থিতি ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, উপন্যাস-শিল্পে স্বগতচিন্তা ও স্বগতোক্তির চূড়ান্ত প্রাধান্যদাতা আইরিশ লেখক জেমস জয়েসকেও (১৮৮২-১৯৪১) জনতামুখী শিল্পী বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য এ জনতা অদৃশ্য জনতা ; কিন্তু অদৃশ্য হলেও এ জনতা মহা প্রাণবান।" [২৪]

---

২৩. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : শিল্প-সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা) ; পৃ. ৩০

২৪. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : অদৃশ্য জনতা) ; পৃ. ২৩ ও ২৪

Dhaka University Institutional Repository

লেখক ও শিল্পীর কাহিনী ও ছবিতে অদৃশ্য জনগণও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এ অদৃশ্য জনতার দৃশ্যমানতার বিষয়টিই রণেশ দাশগুপ্ত বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

'জয় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষ একে অপরের মিত্র। আর সমস্যাটা হচ্ছে জনগণের বাস্তব জীবনের দাবি। কারণ জনগণই তো সকল সম্পদ তৈরি করছে। জনগণ যদি স্বাধীন হতে পারে, সেখানে সাম্য, মৈত্রী জয়ী হবেই।

প্রবন্ধকার মানবজীবনে অমরতার সূত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'মানবিক মূল্যবোধে অমরতার নিরিখ' শীর্ষক প্রবন্ধে। মানুষ তার কৃতকর্মের উপর অমরত্ব লাভ করে। আর মানুষের কর্মই সাহিত্যে স্থান পায়। এ প্রসঙ্গে লেখক যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা হলো :

> "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাকেই যুগ-যুগান্তর ধরে সেই অমরতার সূত্র ধরে রাখতে হয়েছে, রক্ষা করতে হয়েছে, যাতে দৃশ্য অথবা অদৃশ্যভাবে গ্রথিত রয়েছে সামান্য আর অসামান্য নির্বিশেষে সেই মানুষের কীর্তি বা কাজগুলো, যাদের মালা করে গেঁথে বিকশিত হয়ে চলেছে মানুষের যত সৌন্দর্যের মূল্যবোধ।" [২৫]

এ মূল্যবোধের মূলে রয়েছে হাজারো মানুষের সৌন্দর্যপিপাসা। মানুষ তাঁর কীর্তি এবং সৌন্দর্যের সাধনার মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করতে পারে

'সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণের মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নে' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক নতুন সৃষ্টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যে ধারণাটি প্রচলিত তা হলো :

> "সৃজনশীল শিল্পী হচ্ছে নিভৃতের সাধক কিংবা একক বিদ্রোহী ; অপরদিকে জনগণই হচ্ছে গড্ডলিকা প্রবাহ। স্বভাবত এই দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পীগণকে আত্ম-নিবদ্ধ করে তোলে। সৃজনশীল শিল্পী আর জনগণের মধ্যে দূরত্ব গড়ে ওঠার মধ্যে এই ধারণাটা কাজ করে আসছে।" [২৬]

---

২৫. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মানবিক মূল্যবোধের অমরতার নিরিখ) ; পৃ. ১৬

২৬. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণের মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নে) ; পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

লেখক এ প্রচলিত ধারণাটাকে মার্কসবাদী শিল্প সমালোচনার আলোকে মীমাংসা করেছেন। চিন্তা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে জনগণের উদ্যোগী ভূমিকা রয়েছে। ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, 'মেহনতই শিল্পকলার উৎস।' জনগণ যুগে যুগে বিদ্রোহ করে আসছে প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বৃত্তকে ভেঙ্গে নতুন কিছু সৃষ্টি করার মানসে। এ ক্ষেত্রে সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণ পরস্পরের সহায়ক।

'মেহনত শক্তি ও প্রত্যয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক গ্রীক নাট্যকারদের কতগুলো নাটকের আলোকে মেহনতের শক্তি ও প্রত্যয় আলোচনা করেছেন। পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন :

> "পৃথিবী জুড়ে মেহনতী মানুষের শৃঙ্খল-মুক্তির যুগে প্রাচীন নাটকের রাসায়নিক ঐক্য আলসেসটিস উদ্ধারকারী শক্তিমান হারকিউলিসকে নবতর জীবনাভিলাষী নরনারী মাত্রের একান্ত আপনজন করে নিয়েছে। শেলীর নাটকে মানবতার জয়গান হারকিউলিসকে স্নিগ্ধ আলোর মত বেষ্টন করে রয়েছে। বিপ্লবী মানবতাবাদের যুগে এই হারকিউলিসের কাছ থেকে প্রত্যয় পাব না আমরা ?" [২৭]

মেহনতি মানুষের জন্যে মানবতার বিষয়টি সাহিত্যে উপেক্ষা করার নয়। বরং মেহনতি মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়েই বাংলার সাহিত্য এত সমৃদ্ধশালী হয়েছে।

---

২৭. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মেহনতের শক্তি ও প্রত্যয়) ; পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্র-বিবেচনা

চলচ্চিত্র নামক শিল্পমাধ্যমটি রণেশ দাশগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নি। এ শ্রেণির প্রবন্ধে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'চলচ্চিত্রের জনতা প্রবণতা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে জনতার প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের কথা ব্যক্ত করেছেন। চলচ্চিত্রকে জনসন্মুখেই উপস্থাপন করতে হয়। জনতা ছাড়া চলচ্চিত্র অচল। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "চলচ্চিত্র একলা চলার শিল্পকলা নয়। নির্মাতা এখানে গোষ্ঠী এবং দর্শক এখানে জনতা। একে ব্যক্তিগত চিত্রভাণ্ডারে সাজিয়ে রাখার বিন্দুমাত্র সার্থকতা নেই। --- জনতার সামনে উপস্থাপিত শিল্পকলা হিসেবেই চলচ্চিত্রের জন্ম এবং জনতাকে কোন পর্যায়েই ছাঁটাই করে কিংবা দূরে ঠেলে দিয়ে এর প্রক্ষেপণ সম্ভব নয়। এর কারিগরি দিকের যত উন্নতি হচ্ছে, এর প্রক্ষেপণীপটের আয়োজনও ততই দর্শকের সমাজকে ব্যাপকতর ও বৃহত্তর করে চলেছে। এর জনতাপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।" [২৮]

জনগণই চলচ্চিত্রের স্রষ্টা। ভাল-মন্দ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দর্শক বা জনতার অভিমত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার গঠনমূলক চলচ্চিত্রও দর্শকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করে থাকে।

'চলচ্চিত্রের দিক রূপ ও কর্ম নির্ণয়ে চলচ্চিত্র সংঘ' প্রবন্ধেও চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্কের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দর্শক সংঘগুলোর ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। লেখকের মতে চলচ্চিত্রে —

> "বাইরের লোক বলে এতে কিছু নেই। যাকে আমরা বাইরের লোক বলি তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে উঁচুমানের ছবি তৈরী করার কর্মকাণ্ডে।" [২৯]

জনগণের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্প র্ক বিচ্ছিন্ন হলে চলচ্চিত্র ধস নামতে বাধ্য। তাই চলচ্চিত্রের সফলতার ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততাকে বাদ দেয়ার কোন উপায় নেই।

---

২৮. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : চলচ্চিত্রের জনতা প্রবণতা) ; পৃ. ১২৫

২৯. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : চলচ্চিত্রের দিক রূপ ও কর্ম নির্ণয়ে চলচ্চিত্র সংঘ) ; পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্র বিষয়ক রণেশ দাশগুপ্তের অপর প্রবন্ধ হচ্ছে 'নামকরা উপন্যাসের নামকরা ছবি।' উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রবন্ধকার নামকরা উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে সফলতা-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন উক্ত প্রবন্ধে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অনুসরণ যথার্থ না হলে এবং পরিচালকের ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কোন উপন্যাসই মহৎ চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে না। প্রবন্ধকার বিশ্বসাহিত্য থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি সাপেক্ষে তা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন উক্ত প্রবন্ধে।

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তার বহুমুখী প্রক্ষেপণ

বিষয়বৈচিত্র্যের আলোচনায় উপর্যুক্ত প্রবন্ধ বিভাগের বাইরেও রণেশ দাশগুপ্তের বিস্তর প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে তাঁর বহুমুখী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এ শ্রেণির প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 'নদীর নাম বাংলা', 'অমরতার সাধনা', 'আলোর মত, আগুনের মতো, বিদ্যুতের মতো', 'স্বাধীনতা আনুক গুণগত উত্তরণ', 'প্রগতির মানসিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব বিচার', 'যদি একটু ভেবে দেখি', 'সোনার হরিণ', 'আইরিশ, বাংলা, সীয়ান ওক্যাসি', 'বলি বলি করে, বলিতে না পারি', 'রবীন্দ্রনাথ যৌবনের কাছে প্রার্থী' প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'নদীর নাম বাংলা' প্রবন্ধে লেখক গোটা বাংলাকে একটি নদীর রূপকে কখনও শান্ত কখনও চঞ্চলা কখনও বিক্ষুব্ধ রূপে বর্ণনা করেছেন। লেখক উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন :

> "বাংলা' নদীও তেমনি অদৃশ্য এক নদী। অদৃশ্য হয়েও বয়ে চলেছে কলনাদ করে নিরবধি। কলস্বিনী এই নদীও কখনও প্রচণ্ড কোলাহলময়ী। কখনও মধুর ভাষিনী। কখনও শান্তা, কখনও ক্রুদ্ধা। কখনও মন্থরা। কখনও দামিনী।" [৩০]

বহুরূপিনী নদীর মতই বাংলা তার রূপ বদল করতে পারে সময়ের প্রয়োজনে।

পৃথিবীতে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে সমাজ-হিতৈষী কার্যকলাপের মাধ্যমে মানবসমাজে কীর্তি স্থাপন করাই অমরতার সাধনা হওয়া উচিত বলে লেখক মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁর 'অমরতার সাধনা' প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে।

ইতিহাস ও জীবনের চেতনাকে প্রবন্ধকার আলো, আগুন ও বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করেছেন যার মধ্যে কোন ভেজাল দেওয়া যায় না। এদের মধ্যে ভেজাল দিতে গেলেই শুরু হবে বিদ্রোহ। এমনি ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'আলোর মতো, আগুনের মতো, বিদ্যুতের মতো' প্রবন্ধে।

'স্বাধীনতা আনুক গুণগত উত্তরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংবাদপত্রের গুণগত মান উত্তরণের আশা ব্যক্ত করেছেন প্রবন্ধকার।

---

৩০. শেখ হাফাতুল্লাহ্ টুলু (সম্পাদক), সূর্য শপথ (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : নদীর নাম বাংলা), ১৩৭৬, আদর্শ ছাপাখানা, ৫১ ভজহরি সাহা স্ট্রিট, ঢাকা ; পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতিশীল মানুষের মনেও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকতে পারে। এ আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যেও বাছাই করতে হবে কে রক্ষণশীল আর কে প্রগতিশীল। প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্যে লেখকের যে চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা 'প্রগতির মানসিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব বিচার' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাখিদের আকাশে উড়ার পথ আছে, ঢেউয়েরাও নির্দিষ্ট নিয়মের তাগিদে সামনে চলে, আমরাও স্বাধীনতার পথে চলে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমরা কোটি কোটি মানুষ চলেছি একটা নির্দিষ্ট পথে। এমনি দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায় লেখকের 'যদি একটু ভেবে দেখি' প্রবন্ধে।

সোনার হরিণ তথা অলীক স্বপ্নের হাতছানিতে যুগে যুগে মানুষের জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি নেমে এসেছে। লোভ-পাপ, পতন-মৃত্যু, যন্ত্রণা-ক্ষোভ এ সবের মূলে যে কারণটি ক্রিয়াশীল তা হলো - ঐ সোনার হরিণ প্রাপ্তির লোভ। প্রবন্ধকার এ বিষয়টি বিশ্বখ্যাত কতগুলো নাটকের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসহকারে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর 'সোনার হরিণ' প্রবন্ধে।

আইরিশ বিপ্লবী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশের বিপ্লবী সাহিত্যের বিশেষ করে উপন্যাস ও নাটকের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়েও ভেবেছেন প্রবন্ধকার। 'আইরিশ, বাংলা, সীয়ান ওক্যাসি', তাঁর এ শ্রেণির একটি প্রবন্ধ।

কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের লাহোর থেকে ঢাকা সফরে এসে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা আর তিনি বলতে পারেন নি ; না বলাই রয়ে গেছে ; যেন বলতে চেয়েছিলেন, উপমহাদেশের দু'প্রান্তের বাসিন্দারা পরস্পরের কাছে পরস্পরের অন্তর মেলে ধরতে গিয়ে মেলতে পারেন নি। অন্তরে জমানো কথা অন্তরেই রয়ে গেছে। কবির এ আক্ষেপটিই রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর 'বলি বলি করে, বলিতে না পারি' প্রবন্ধে রূপদান করেছেন।

তারুণ্যের অমিত শক্তি বলে তরুণেরা সমাজের পট পরিবর্তন করতে পারে। এ বিশ্বাসবোধ রণেশ দাশগুপ্তের মধ্যেও ছিল। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের যৌবন-চেতনাকে দেশী-বিদেশী খ্যাতনামা বহু লেখকের যৌবন-চেতনার সঙ্গে তুলনা করে উপস্থাপিত করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ: যৌবনের কাছে প্রার্থী' প্রবন্ধে।

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে এই বিচিত্র বিষয়ের পাশাপাশি সাহিত্য-শিল্প নিয়েও বিশেষ ভাবনা লক্ষ করা যায়। তিনি যে শুধুই গণমানুষের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা করেছেন এবং তাঁর লেখায় তা প্রতিফলিত হয়েছে, এমন নয়। রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কেও পৃথক ধারণা ছিল। এ ধারণা অমার্কসবাদীদের সঙ্গে মেলে না, মার্কসবাদীদের গতানুগতিক ধারণা থেকেও পৃথক। রবীন্দ্রনাথকে মার্কসবাদীরা যখন বুর্জোয়া কবি বলছেন, জীবনানন্দ দাশকে বলছেন বিচ্ছিন্ন অন্তর্মুখী কবি, সেই সময় রণেশ দাশগুপ্ত এঁদের দুজনের লেখায় দেখেছেন গণমানুষের আত্মজাগরণের সূত্র। লেনিন যেমন সামন্ত লেখক লেভ তলস্তয়কে বলেছিলেন রুশ বিপ্লবের দর্পণ এবং তলস্তয়ের লেখায় দেখেছিলেন রাশিয়ার মেহনতি মানুষের উত্থানের সংকেত, রণেশ দাশগুপ্তও তেমনি রবীন্দ্র-জীবনানন্দ দাশের লেখায় পেয়েছিলেন জীবনকে নতুনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইতিবাচক ইঙ্গিত। রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-শিল্পভাবনা তাই সমকালীন অন্যদের চেয়ে পৃথক, এর একটি বৈশ্বিক ব্যাপ্তি এভাবেই পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য-ভাবনা

মানুষ জন্মগতভাবেই একে অন্যের চেয়ে পৃথক। এ পৃথকত্বটুকু তার অবয়বে ; তার চিন্তায়, তার ভাবনায়। এখানেই সে স্বতন্ত্র মানুষ। এ স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ভাবনা তার একেবারেই নিজস্ব সম্পদ। তার এ ভাবনার ক্ষেত্রে অন্য কারও প্রভাব খাটে না। তার এ সুপ্ত ভাবনাগুলোই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। আর তিনি যদি হন একজন রাজনীতিবিদ, সমাজ ও কালসচেতন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বিবেকবান সাহিত্যিক, তবে তাঁর ভাবনা সাহিত্যকে ঘিরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রণেশ দাশগুপ্ত ঠিক এরকমই একজন মানুষ। আজীবন সংগ্রামী এ মানুষটি অন্তঃপ্রেরণায় এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। তাঁর বহু প্রবন্ধে সাহিত্য-ভাবনাটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। বিশুদ্ধ অর্থে সাহিত্য-ভাবনাটা শুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এবং পূর্ণতা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখের চিন্তার স্পর্শে এসে। এরপর সাহিত্য-ভাবনার শাখাটি পল্লবিত হয়েছে চিন্তাশীল সাহিত্যিকের মাঝে।

পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশ পর্ব থেকেই রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের মাধ্যমে সাহিত্য-প্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর যেসব চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে তা শুধুমাত্র পাঠককে আনন্দ দান করার জন্যেই নয়, তাতে দেশ, সমাজ ও জাতির স্বার্থে অধিকার-বঞ্চিত শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের কথাই বলা হয়েছে। সাহিত্য কি, কি তার কাজ, কি তার নীতি এসব বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' গ্রন্থের 'সাহিত্য' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে। লেখক এখানে সাহিত্যের মৌল প্রবণতাকেও উন্মোচিত করেছেন। এছাড়াও সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণের মধ্যেও সাহিত্য-চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। রণেশ দাশগুপ্তের মতে :

Dhaka University Institutional Repository

"সাহিত্যকার প্রধানতঃ শব্দশিল্পী। আর শব্দশিল্পী শিল্পী হিসাবে আমাদের মানবীয় বৃত্তি, আবেগ এবং অনুভূতির কারবারী, আমাদের মানবিকতা কথাকে আশ্রয় করে মেঘ দর্শনে ময়ুরের মতো আত্মপ্রকাশ করে তাকেই বলবো সাহিত্য।" [১]

সাহিত্য যে, মানবীয় আবেগ, অনুভূতি ও প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ সে কথাই রণেশ দাশগুপ্ত বোঝাতে চেয়েছেন। সাহিত্য অনেকটা শব্দের খেলা। যে খেলা মানবীয় আচার- আচরণ ও রীতি-নীতিকে নিয়ে।

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের- গতিধারা পরিবর্তিত হয়েছে। এ-যুগের পাঠক সাহিত্যে খুঁজে বিস্তার ও গভীরতা। মানবীয় গভীরতর প্রদেশে সাহিত্যের অধিষ্ঠান। মানবীয় আবেগ-অনুভূতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য অন্য কিছুর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। রণেশ দাশগুপ্ত বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের স্থূল-সূক্ষ্ম পরস্পর বিরোধী বেশ কিছু সংজ্ঞা উপস্থাপিত করে মানবীয় প্রবৃত্তি, আবেগ ও অনুভূতিকেই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বলে মনে করেছেন।

আমাদের বাস্তবজীবনে কোন কিছুতেই পূর্ণতা নেই। তাই বাস্তবে যা কিছু আছে, তাকে নিয়েই একজন সাহিত্যিকের জীবন সীমাবদ্ধ নয় বরং যা হওয়া উচিত সেটাই তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ পায়। তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে যে কল্পনার জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন তাতে কোন ফাঁকি থাকে না, কোন অপূর্ণতা থাকে না, বরং যা থাকা উচিত তাই থাকে। রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্যের এমন এক সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। সাহিত্য-শিল্পের রূপ-কল্পনাকে রণেশ দাশগুপ্ত স্বীকার করেছেন। বাস্তবতা থেকেই আসে রূপ-কল্পনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত :

"এই বাস্তব পরিবেশকে যখন আমরা কেবল তার বর্তমান চেহারা দেখে বিচার করি, তখন তার সবটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। বাস্তব পরিবর্তনশীল এবং তার গতিধারায় তার আসন্ন রূপ নিহিত থাকে। মানুষ আপন প্রয়োজনানুসারে এই নিহিত সত্তায় পৌঁছতে না পারা পর্যন্ত বাস্তব, পরিবেশকে অনুকূলে আনতে পারে না। বাস্তব পরিবেশ বলতে আমরা বোঝবো, সম্ভাবনার উপাদান সমেত বাস্তব। এই সম্ভাবনাই, রূপ-লোকের কাঠামো। শিল্পীর মায়ালোকের স্বপ্নকল্পনা এই বাস্তব সম্ভবনাকে তুলে ধরে। এই সম্ভাবনা কর্মে প্রতিফলিত হয়ে শ্রেয় ও প্রেয়কে দেয় আকৃতি।" [২]

---

১. রণেশ দাশগুপ্ত, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, (প্রবন্ধ : সাহিত্য), ১৯৬৬, মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ; পৃ. ২

২. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত ; পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

লেখক বাস্তবতাকে সঙ্গোপনে মনে ধারণ করে, কামনা বাসনার পাখায় ভর করে তিনি রূপদান করেন সাহিত্য-কর্মকে। এক্ষেত্রে বাস্তবতার চেয়ে আবেগ-অনুভূতিই বেশি প্রাধান্য পায়। বিমূর্ত থেকে সাহিত্য হয়ে ওঠে মূর্তমান। রণেশ দাশগুপ্ত বিশ্বাস করেন, সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পকলার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য :

> "সাহিত্যের নাড়ীর বন্ধন রয়েছে অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে। শুধু তাই নয়। নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধা সে সাধারণ ভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে মানবতার সঙ্গে, সমগ্র মানব সমাজের গতি বিস্তারের সঙ্গে।" [৩]

সাহিত্যকে বুঝবার জন্যে তাই সমগ্র মানব-সমাজের বিকাশ সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক বলেও রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একজন লেখকের মানবীয় বৃত্তি তথা সংস্কৃতি ও আবেগ-অনুভূতিকে উপলব্ধি করার প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন।

সংস্কৃতি থেকে শিল্পকলার জন্ম, আর শিল্পকলা থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি এ ধারণা রণেশ দাশগুপ্তের। তাঁর ভাষায়,

> "কুঁড়ির মধ্য দিয়ে যেমন পাপড়ি বেরেয়ে আসে, তেমনি সংস্কৃতির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে শিল্পকলা। আর, শিল্পকলার ক্রমবিকাশের মধ্য থেকে এসেছে সাহিত্য।" [৪]

এ প্রসঙ্গে ড. সৌমিত্র শেখর লিখেছেন :

> "এই বক্তব্যটি কিন্তু ক্রিস্টোফার কডওয়েলের অভিমতের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। কডওয়েল তাঁর Illusion and Reality গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : Art is the product of society, as the pearl is the product of the oyster, and to stand outside art is to stand inside society. কডওয়েলের সঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের বক্তব্যের এই মিলের কথা মনে রেখেও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। কারণ তিনি সমাজ, জীবন, অভিজ্ঞতা - এ-সবের বাইরেও কিছু বলতে চেয়েছেন। তাঁর মন্তব্য : 'সমস্ত শব্দ ও পদবিন্যাসই সাহিত্য নয়। মানব-সামাজের জীবনের অভিজ্ঞতা শব্দ ও পদবিন্যাসে লিপিবদ্ধ হলেই সাহিত্য হয়ে যায় না। মানব-সমাজের

৩. প্রাগুক্ত ; পৃ. ৭

৪. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রগতির পথে, জীবনের সৌন্দর্য সাধনার প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে এসেছে শিল্পকলা। বিশেষ একটি ক্রিয়াকলাপ হিসাবে তার উৎপত্তি ও বিকাশ।' এখানে 'সৌন্দর্য সাধনার প্রকিয়া' এবং 'বিশেষ একটি ক্রিয়াকলাপ' এই প্রতীতিদ্বয় বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত এই বোধই আমাদের জন্মাবে, যার তুলনা অতুল চন্দ্র গুপ্তের কাব্য জিজ্ঞাসা গ্রন্থের এক জায়গায় পাওয়া যায় ; এবং তা-হলো 'রমণী দেহের লাবণ্য যেমন তার অবয়ব সংস্থানের বাইরের জিনিস, তেমনি মহাকবিদের বাণীতেও এমন বস্তু আছে যা ভাব শব্দ বাক্যের অতিরিক্ত আর কিছু।' অব্যাখ্যাত এই 'বাইরের জিনিস' এবং 'অতিরিক্ত আর কিছু' উপরিউক্ত প্রতীতিদ্বয়ের সমভাবাপন্ন। আর এ-কারণেই সাহিত্য সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্তের অভিমতে যেমন লক্ষ করা যায় কডওয়েলের বিষয় চিন্তার প্রতিফলন, তেমনি এর সঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের নন্দনতাত্ত্বিক আলঙ্কারিক মতের দূর-স্পর্শও আবিষ্কার করা যেতে পারে।" [৫]

অর্থাৎ রণেশ দাশগুপ্তের চিন্তায় মার্কসবাদের প্রথানুগত্য প্রকাশ পায় নি, প্রতিফলিত হয়েছে বস্তুবাদী ও সৌন্দর্যবাদী উভয় মতের সংমিশ্রিত রূপায়ণ। একজন সৃজনশীল মানুষের কাছে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি মূলত অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা নিজস্ব ভাবনার প্রভাব এর যে-কোনটিতেই পড়তে পারে। রণেশ দাশগুপ্তের ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছে–তাঁর রাজনীতি আর সাহিত্য-চিন্তা অবিচ্ছিন্ন থাকে নি, এক হয়ে গেছে, মিশে গেছে একে অপরের সঙ্গে।

জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলাই সাহিত্যের কাজ। 'জীবনের জন্যই সাহিত্য' এ চিন্তাটিও রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-চিন্তায় অভিব্যক্ত। সাহিত্য মূলত মানবজাতির আত্মার প্রতি চির কল্যাণকর সাধনা। বিশুদ্ধ সাহিত্যই পারে মানুষকে সৎ ও সত্যবাদীরূপে গড়ে তুলতে। সাহিত্য ভাবনার ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্ত প্রকৃতির উপর মানব-মনের প্রভাবের বিষয়টি নিরীক্ষা করেছেন। কখনও কখনও মানুষের -

402474

"আবেগ অনুভূতি ও প্রবৃত্তির স্বাক্ষর এঁকে দেয় বিশ্বপ্রকৃতির উপর। বিশ্বপ্রকৃতি সামগ্রিক অথবা খণ্ডিতভাবে মানুষের কামনা বাসনার শীলমোহরে অঙ্কিত হয়ে চেহারা পাল্টে ফেলে। গিরিশিখর হয় মৌনী ধ্যানী। ফুল হয় সুগন্ধি। শ্রাবণের বারিধারা হয় প্রিয়ার অশ্রু। ঝড় হয় বেদনার দীর্ঘশ্বাস। নিসর্গকে মানুষের অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে উঠতে বসতে হয়।" [৬]

---

৫. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত (ড. সৌমিত্র শেখর রচিত প্রবন্ধ : 'রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-ভাবনা') ; পৃ. ২৮৯

৬. রণেশ দাশগুপ্ত, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, (প্রবন্ধ : সাহিত্য), প্রাগুক্ত ; পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বপ্রকৃতির নানা উপাদান মানবমনের কামনা বাসনাকে বহুভঙ্গিমায় রূপায়িত করে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এ অতি সাধারণ বিষয়টিও রণেশ দাশগুপ্তের ভাবনায় ধরা পড়েছে।

সাহিত্য মানুষের অভিজ্ঞতা জারিত অনুভূতির ফসল। সাহিত্য কোন প্রত্যাদেশ বা দৈববাণী নয়, এটি বেরিয়ে এসেছে শিল্পকলার একটি বিশেষ শাখা থেকে। রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্যকে শিল্পকলার খানিকটা পরিণতির ফল হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাহিত্য বিবেচনায় রণেশ দাশগুপ্ত সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদকে সামনে এনেছেন। মেহনত সকল সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও সাহিত্যের জাদুদণ্ড। মেহনতই সাহিত্যের অফুরন্ত সৃজনীধারা যুগিয়েছে। মেহনত জীবিকার অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে শোষক-শ্রেণির নিগড় ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। যেখানে আজও শ্রেণিসমাজ বিদ্যমান, সেখানে সাহিত্য সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা বিকৃত ও খণ্ডিত। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সাহিত্যের সংজ্ঞাও শ্রেণি আওতামুক্ত হতে পারে না। তাই সমাজে শ্রেণি-সংগ্রাম আজও বিদ্যমান আছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি :

> "শ্রেণী-সমাজের সাহিত্যের চেতনা একদিকে একচেটিয়া, অন্যদিকে মেহনতের ভার। একদিকে ভাব, অন্যদিকে অভাব। --- একদিকে অমৃত, আরেকদিকে গরল। শ্রেণী সমাজের সাহিত্য-সংজ্ঞা একদেশদর্শী না হয়ে পারে ? সংজ্ঞা দেবার অধিকারও তো অবনত শ্রেণীগুলির চৌহদ্দির মধ্যে ছিল না। --- কোন একটা বিশেষ শ্রেণীসমাজ যে কায়েমী হয়ে টিকতে পেরেছে তা নয়। নিরন্তর চলেছে সংগ্রাম।" [৭]

অর্থাৎ রণেশ দাশগুপ্তের মতে, সাহিত্য আদিতে ছিল না। শ্রেণির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই সাহিত্যের জন্ম।

একটি সুস্থ সমাজই প্রগতিশীল সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে। সংস্কৃতি থেকে জন্ম নেয় শিল্পকলা আর শিল্পকলা থেকে সৃষ্টি হয় সাহিত্যের। সাহিত্য বিকাশের জন্যে প্রয়োজন সুশীল সমাজ ব্যবস্থা। তাই, সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্ত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রণেশ দাশগুপ্তের মতে, ভাষা থেকেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ভাষা আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। তাঁর মতে :

> "সাহিত্যের কথা আনীত হয়েছে ভাষা থেকে। কিন্তু ভাষা আর সাহিত্য এক নয়। --- মানব সমাজের অগ্রগতির উপাদান হিসাবে ক্রমবিকাশের পথে এসেছে ভাষা- শব্দ, পদ, ব্যাকরণ ---

---

৭. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত ; পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

> বাস্তব পরিবেশের সম্পর্কে, জীবন-যাপনে শিল্পকলায় ভাষার যে প্রয়োগ তাই সাহিত্যের কথাশিল্পের দিক। আদি শিল্পকলায় মিশ্রিত উপকরণের অন্যতম হিসাবে ভাষার স্থান হয়েছিল। শিল্পকলার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন প্রকরণের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুভাষিত শিল্পকলা তার সাহিত্য-সত্তা নিয়ে বেরিয়ে এল।" [৮]

তাই সংস্কৃতি শিল্পকলা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এদের একটিকে অপরটি পূর্ণতা পায় না।

শুধুমাত্র শব্দ ও পদবিন্যাসই সাহিত্য নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হতে পারে না। মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি ও প্রবৃত্তির রূপায়ণই সাহিত্যের মুখ্য বিষয়। সাহিত্যকে তিনি বিবেচনা করেছেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনলীলার সাথী হিসেবে। মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাবলি নিয়েই সাহিত্য। এ প্রসঙ্গে লেখক প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও আরও অনেকের মন্তব্যকে তাঁর প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছেন :

> "প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, যার একদিকে মধু আর অন্যদিকে ভ্রমরগুঞ্জন সেই তো সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়, যা সঙ্গে থাকে তাইতো সাহিত্য ; মানুষের জীবনলীলার সাথী ।" [৯]

রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশীদের বহু কবির কবিতা নিয়েও অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যে সব কবিদের কবিতায় দেশ, সমাজ, জাতি ও সংগ্রামের কথা তথা মানবকল্যাণ নিহিত রয়েছে রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্য-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সে সব কবিতাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর এ শ্রেণির প্রবন্ধ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল :

বাংলা সমকালীন কবিতার চারটি ধারা - মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারা, যুগ নিরপেক্ষ কবিতার ধারা, সমকালীন বিশ্বচিন্তার ধারা ও গণকাব্যের ধারা প্রভৃতি নিয়ে ভেবেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। 'আমাদের ঘরের কাছে সাম্প্রতিক কবিতার চুম্বক' প্রবন্ধে এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত বলেছেন। লেখকের মতে, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারা পাক-বাংলা নামকরণের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতাতেও ভাব ও রূপকল্পের স্বতন্ত্র-সত্তাকে চিহ্নিত করে নিতে চেষ্টা করেছেন। সমাকালীন কবিতার দ্বিতীয় ধারা নিয়ে লেখক হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কোন বিশেষ যুগে বা

---

৮. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত ; পৃ. ২২ ও ২৩

৯. রণেশ দাশগুপ্ত, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (প্রবন্ধ : সাহিত্য), প্রাগুক্ত ; পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মবোধে বিভক্ত না করে, অবিন্যস্ত ধারাবাহিকতায় এগিয়ে যাবার কথা ভেবেছেন। কবিতার তৃতীয় ধারার ক্ষেত্রে লেখক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার কথা ভেবেছেন। সমকালীন কবিতার চতুর্থ ধারায় সমাজের নিপীড়িত জনতা লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে তার চিত্রাঙ্কনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এভাবে সমকালীন কবিতার ধারায় তার সাহিত্য-ভাবনাটি প্রকাশিত হয়েছে।

অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর মেহনতি জনগণের সমষ্টিগত অধিকারের সংগ্রাম। এ বিপ্লবে কবিতা হয়ে উঠে গণমুখী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসেন কবি মায়াকভস্কি, আলেকজাণ্ডার ব্লক, পাস্তেরনাক এবং এসেনিন। গণমুখী বিপ্লবের কবিতা লিখে তাঁরা জনগণের জয় ঘোষণা করলেন। এতে স্বাধীনতা-চেতনা আরও প্রসারিত হয়েছে বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁর ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে 'অক্টোবর বিপ্লবের কবিতা বিচার' প্রবন্ধে। অক্টোবর বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক ধারায় কবিতার গণমুখী চেতনার প্রভাব সম্পর্কে লেখক বলেছেন :

> " অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসের বিপ্লবী ধারায় একটা অনন্যপূর্ব ঘটনা। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর মেহনতী জনগণের সমষ্টিগত অধিকার, অর্থনৈতিক উৎপাদনে যৌথ প্রয়াসের প্রাধান্য এবং এ প্রয়াসকে ভিত্তি করে মেহনতী জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস সাংস্কৃতিক জীবনেও একটা অনন্য বিন্যাস নিয়ে আসে। শিক্ষা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণের সামগ্রিক বিকাশের তাগিদ প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং কবিতা যে জনগণের জন্য, কবিতা যে গণমুখী – এই দাবী অনিবার্য হয়ে সামনে আসে। শুধু লোক-কবিতার আঙ্গিকে নয়, ধ্রুপদী এবং আধুনিক কবিতার পরীক্ষা নিরীক্ষাতেও এই গণমুখিতা চায় অবিভাজ্য এবং দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ।" [১০]

গণচেতনার প্রভাবকে কবিতায় গ্রহণ করে, কবি মায়াকভস্কি, আলেকজাণ্ডার ব্লক, পাস্তেরনাক ও এসেনিন জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করতে পেরেছেন বলে রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন।

---

১০. আবুল হাসনাত (সম্পাদক), গণসাহিত্য (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'অক্টোবর বিপ্লবের কবিতা বিচার'), ১৯৭২, ১ম বর্ষ, ৪র্থ : ৫ম সংখ্যা ; পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যকে প্রবহমান নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। নদীর মতো সাহিত্যের একটা গতি আছে, প্রবহমানতা আছে। নদীর মতো এরও রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। তবে সৃষ্টিশীলতার অভাবে এ সাহিত্যও স্রোতবিহীন নদীর ন্যায় প্রবহমানতা হারাতে পারে ; যাকে রণেশ দাশগুপ্ত 'মরা গাঙ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এ ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' গ্রন্থের 'নজরুল কাব্য প্রবাহের জঙ্গম বিচার' প্রবন্ধে। যেখানে তিনি বলেছেন :

> "নজরুল-কাব্যের বিভিন্ন দিক পূর্ব বাংলার নদী প্রবাহের স্বভাব বিশিষ্ট। আমরা এর জঙ্গম রূপ আবিষ্কার করেছি। যদি সে ছবি হয়েও থাকে, তবে সে ছবি চলমান, ধাবমান, বহমান, চঞ্চল।" [১১]

সাহিত্যের গতিময়তার ভাবনাটি রণেশ দাশগুপ্তের 'কবিতা যেন জীবন্ময়ী নদী' প্রবেন্ধও লক্ষণীয়। যেখানে কবিতাকে গতিশীল মানবজীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গণজোয়ারের চেতনায় রচিত কবিতা নদীর জোয়ারের মতোই প্রবহমান। এ প্রসঙ্গে লেখকের ভাবনা নিম্নরূপ :

> "দেশে দেশে জনগণ একেকটি অব্যাহত জীবনময় প্রবাহ। ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধ যাঁরা করলো তাঁরা ফ্রান্সের অপরাজেয় জনগণ। কবিতা তাই হলো অপরাজেয় বিপ্লবী। বাংলাদেশের কবিতার জীবন্ময়ী নদী সম্পর্কেও একই কথা বলতে পারা যায় নিশ্চয় - বিশেষ করে বাংলাদেশের পটভূমিতে।" [১২]

গণজোয়ারের চেতনায় রচিত কবিতা নদীর জোয়ারের মতোই প্রবহমান। কবিতা সৃষ্টির অন্যতম তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধকারের চিন্তায়।

রণেশ দাশগুপ্ত নেরুদা-কাব্যের ভাবগত ও শিল্পরূপগত বৈশিষ্ট্য নিয়েও ভেবেছেন। তাঁর 'নেরুদা কাব্য জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে :

> "একটি বিশেষ পদ্ধতিকে শিল্পভাবরূপে প্রয়োগ করে নেরুদা কবিতাকে করেছেন একই সঙ্গে আনন্দবেদনার, জয়ের নিনাদ ও ব্যর্থতার ক্রন্দনের, সাম্যবাদী নির্মাতাদের এবং শহীদদের কীর্তির ভাবাধার। এই পদ্ধতি হচ্ছে বহুমানবিক বিকিরণ পদ্ধতি। আলো যেমন নিজেকে ধাবিত

---

১১. রণেশ দাশগুপ্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : নজরুল-কাব্য প্রবাহের জঙ্গম বিচার), প্রাগুক্ত ; পৃ. ৯৪

১২. আবুল হাসনাত (সম্পাদক), গণসাহিত্য (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'কবিতা যেন জীবন্ময়ী নদী'), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৯, ঢাকা ; পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

করে অজস্র কণায় কণায় অথবা কলনাদিনী নদী যেমন লক্ষ লক্ষ তরঙ্গে নিজেকে প্রভাবিত করে, পাবলো নেরুদা ঠিক তেমনিভাবে জাতীয় মুক্তি আর সাম্যের সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষাকে অজস্র অসংখ্য মানব-মানবী চিত্তের উচ্চারণে স্পন্দিত করে তুলেছেন নিজেকে অসংখ্য মানব-মানবীতে পরিণত করে। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি তাঁর নয়। পাবলো নেরুদার কবিতা প্রসঙ্গে, এই পদ্ধতিকে কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে উজার করে দেয়া। --- নেরুদা-কাব্য জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে বর্তমান বিশ্বকবিতার তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হলে আমরা দেখবো, এ বিশ্বে যেখানেই মানবের মুক্তির ধ্বনি, সেখানেই নেরুদার কবিতার বাণী।"[১৩]

রণেশ দাশগুপ্তের মতে নেরুদা তাঁর সৃষ্টিকর্মে একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন বলে, তিনি সৃজন করেছেন মানুষের আনন্দ, বেদনা, জয়, ক্রন্দন, আত্মত্যাগ ও জীবনের যুগপৎ কীর্তি। মানবমুক্তির বাণী তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

রণেশ দাশগুপ্ত রবীন্দ্র-কাব্যের দু'টি দিক বিশ্লেষণ করেছেন, তা হলো- সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে পাশাপাশি দু'টি জগৎ ; অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সমমূল্যে বিন্যস্ত হয়েছে। এ দু'ধরণের বিপরীতমুখী বহুমাত্রিক বিন্যাসের সহ-অবস্থানের দাবি মেটাতে যেয়ে কবিমনে যে অস্থিরতা ও গভীর অন্তর্বিরোধের বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে তা কবির সারা জীবনের কাব্যের ধারায় প্রতিভাত হয়েছে। এমনি ধারণা রণেশ দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধের বৈপ্লবিকতা' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের প্রবন্ধে উল্লেখ আছে:

" বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যেই দুটি জগৎ পাশাপাশি সমগুণে এবং সমপরিমাণে গুরুত্ব লাভ করেছে। অন্তর ও বাহির, ব্যাক্তি ও লোকসমাজ, প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তি, আমি এবং আমরা, স্বদেশ ও বিশ্ব, আত্মসমর্পণ ও বিদ্রোহ, সুষমা ও কিম্ভুতকিমাকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতন্ত্র, সংঘাত ও প্রশান্তি যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর কাব্যে জায়গা করে নিয়েছে।" [১৪]

---

১৩. প্রাগুক্ত, গণসাহিত্য (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'নেরুদা কাব্য জিজ্ঞাসা'), ২য় বর্ষ, ১ম : ২য় সংখ্যা, ১৯৭৪ ; পৃ. ৩৩ ও ৪১

১৪. ম. হামিদ (সম্পাদক), সৌরীয় সংলাপ (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধের বৈপ্লবিকতা') ১৯৭৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ; পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রমে জাতিপ্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করণীয়গুলোকে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক কবিদের কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন প্রবন্ধকার। এ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ রয়েছে 'শ্রমজীবী বিপ্লবে জাতিপ্রশ্নে তত্ত্ব ও কবিতার সহযোগিতা' প্রবন্ধে।

রণেশ দাশগুপ্ত ভাষার সঙ্গে কবিতার নিগূঢ় সম্পর্কটি নিয়ে চিন্তা করেছেন তাঁর 'কবিতা, ভাষা, মাতৃভাষা' প্রবন্ধে। এ ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন কবি, দার্শনিকের উদ্ধৃতি টেনেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধে লক্ষ করা যায় :

> "ফরাসী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে দর্শনের তরফ থেকে এবং ইতালির কবি কাসিমাদো কিংবা বাংলার জীবনানন্দ দাশ কবিতার তরফ থেকে যথাক্রমে ভাষাকে ছাড়িয়ে যাবার এবং ভাষাকে নিয়ে চলার দুই পৃথক প্রবণতাকে খোলাখুলিভাবে সামনে এনেছেন। দর্শনের সত্য আর কবিতার সত্য যদি একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়, তা কবিতার সত্যটিকে রাখতে হয় তার ভাষার অবয়বে। --- রবীন্দ্রনাথ ভাষার প্রাথমিক মৌলিক সত্তাকে নির্ধারিত করেছেন এইভাবে, 'সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে প্রাণগত, মনোগত মিলনের আদান-প্রদানের উপায় স্বরূপ মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা।' --- লুই আরাগঁ তাঁর বক্তব্যকে খুব সাধারণভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, 'কবিতা হচ্ছে ভাষা, কারণ একজন কবির কাছে প্রথমে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করার চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কিছু নেই।" [১৫]

কবিতার ভাষা-মাতৃভাষা, লোকভাষা তথা গণভাষা। কোন কবি কোন অবস্থাতেই মাতৃভাষা ছাড়া কবিতা লিখতে পারেন না। অন্য ভাষায় কবিতা লিখতে গেলে তার ভাবগত, মনোগত ও প্রাণাগত বিষয়টি প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই কবিতা রচনার ক্ষেত্রে লেখক মাতৃভাষা ব্যবহারকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন যুদ্ধ-প্রস্তুতির সময়ও ফরাসীর পল এলুয়ার, লুই আরাগরঁ, আঁদ্রে জিদ, জাঁ ক্রিস্তফ, আলবেয়ার কামু, পিকাসো প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীর বিরুদ্ধ আবেষ্টনীতে অব্যাহত গতিধারায় যা কিছু সৃষ্টি করে গেছেন তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ফার্সি কবিতায় অব্যাহত ধারা সম্পর্কে লেখকের যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তা 'অব্যাহত কবিতার জন্য' প্রবন্ধে লক্ষ করা যায় :

---

১৫. রণেশ দাশগুপ্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : কবিতা ভাষা মাতৃভাষা), প্রাগুক্ত ; পৃ. ৬৮, ৭০ ও ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

'পিকাসোর চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটেছে আধুনিক ফরাসী কবিতার এবং কবিদের সাহচর্যে, এপলনেয়ার থেকে শুরু করে এলুয়ার কর্তৃক প্রভাবিত পরিবেশে। পিকাসোর ছবির বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক স্বীকৃতি ও জয়-জয়কারের মধ্য দিয়ে ফরাসী অব্যাহত ধারাও পেয়েছে স্বীকৃতি।' [১৬]

রণেশ দাশগুপ্ত ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ করে কবিতার অব্যাহত গতিধারার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। পল এলুয়ারের 'অব্যাহত কবিতা' কাব্যগ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। মানবজীবনের গতিময়তার সঙ্গে কাব্য-সাহিত্যের অব্যাহত ধারাকে রণেশ দাশগুপ্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের নব নব চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' প্রবন্ধে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে :

"সন্ধ্যা' কাব্য থেকে 'খেয়া' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে জীবন, তা যেন একটা রংধনুকের মত আকাশের এক পার থেকে অন্য পারে নেমে গেছে। মনে হয়, এই বুঝি হয়ে গেল তাঁর কবি-জীবনের সমাপ্তি। কিন্তু এর গায়ে লেগেই দ্বিতীয় আরেকটা রংধনু জেগে ওঠে। 'বলাকা' থেকে এই দ্বিতীয় রংধনুকের উত্থান শুরু, 'পরিশেষ' কাব্যে এর অবতরণ। এখানেও কি শেষ? তাও নয়। আবার 'নবজাতক' কাব্যে তৃতীয় আরেক রংধনুকের আকাশে ওঠা। আর শেষ ? কোথাও কি শেষ ?" [১৭]

এমনিভাবে রবীন্দ্র-কাব্যে চেতনার স্তরগুলো রণেশ দাশগুপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন উক্ত প্রবন্ধে। রবীন্দ্র-কাব্য যেন প্রবহমান নদীর মতো গতিশীল। নদী-প্রবাহ যেমন বিভিন্ন বাঁকে এসে মোড় নেয় রবীন্দ্র-কাব্যও তেমনি বিভিন্ন স্তরে গতি পরিবর্তন করে অনন্তের পানে এগিয়ে চলে।

চিত্রশিল্পী ও কবি উভয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের বিষয়টি নিয়েও ভেবেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। শিল্পীর স্বাধীনতা শিল্পকর্মের অন্যতম পূর্বশর্ত। এ স্বাধীনতা হরণ করলে কিংবা শিল্পী নিজে এ স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে তাঁর সৃষ্টকর্ম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত হবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

---

১৬. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : অব্যাহত কবিতার জন্য) ; পৃ. ৮৪

১৭. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : আলো দিয়ে আলো জ্বালা) ; পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

"অবশ্য একটা কথা বোধ হয় মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, শিল্পকলার উপাদানগুলিরও এমন সব সত্তা রয়েছে, যাদের নিগূঢ় পরিচয় শিল্পীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ, কথা হোক, রং হোক,- এদের বিন্যাস দাঁড়িয়ে থাকে এদের বস্তুসত্তার উপর। কথা-ঘন আধুনিক কবিতা এবং রং-এর স্তূপরূপী আধুনিক ছবিতে কথা ও রং-এর এই বস্তুসত্তা উগ্রভাবে স্বীকৃত। আর এই স্বীকৃতিই কি তুলে দেয়নি কবি আর চিত্রীর আঙ্গুলে মুক্তির সূত্রকে?" [১৮]

মূলত কবি ও চিত্রী উভয়েরই সৃষ্টির স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয় বলে রণেশ দাশগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁর একাধিক প্রবন্ধে। 'ছবি ও কবিতার শাসন প্রশ্রয়,' 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা' প্রভৃতি তাঁর এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। লেখক 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' প্রবন্ধে বলেছেন :

'সমাজতন্ত্রের বিবেচনার মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন ঠিক সেইভবে সমাধান দাবি করে, যেমনভাবে যৌথখামার দাবি করে ট্রাক্টর । এ দাবি অপ্রতিরোধ্য।' [১৯]

ট্রাক্টর ছাড়া যেমন যৌথখামার তৈরী করা যায়না তেমনি স্বাধীনতা ছাড়া কোন শিল্পীই ভাল কিছু করতে পারেন না। সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তাকে রণেশ দাশগুপ্ত সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত চেয়েছেন সকল শিল্পীমনেই যাতে স্বাধীনতা ও সততা অম্লান থাকে। শিল্পীর স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে রণেশ দাশগুপ্ত বোঝাতে চেয়েছেন যে, আধুনিক ধনতন্ত্র যেমন শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না তেমনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। এ প্রসঙ্গে 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

"স্বাধীনতা এবং সত্যনিষ্ঠার জন্য শিল্পীর নিজস্ব তাগিদ কিংবা জনগণের তরফ থেকে শিল্পীর কাছে এই দুই উপকরণের দাবী বিশ্বব্যাপী আলোড়নে ও ঘাত প্রতিঘাতে স্পন্দিত। যে সব দেশে

---

১৮. প্রাগুক্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : ছবি ও কবিতার শাসন প্রশ্রয়) ; পৃ. ৯১

১৯. প্রাগুক্ত, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (প্রবন্ধ : শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে) ; পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

> সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে কিংবা গড়ে উঠবার মুখে, সেখানেও শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততার বিকাশের প্রশ্নে যবনিকা পতন হয় নি ; সেখানে মাত্র প্রথম দৃশ্য, কিংবা বড় জোর দ্বিতীয় দৃশ্যের পর্দা উঠেছে।" [২০]

চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যশিল্পী উভয়ের ক্ষেত্রেই কর্মের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয় বলে রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি 'ছবি ও কবিতার শাসন প্রশ্রয়' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> "বস্তুত, কথার শাসন মানবার পাত্রই ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চের ভূমিকা দ্রষ্টব্য: যথা, 'গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়; পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে, তা দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। --- অবশ্য একটা কথা বোধ হয় মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, শিল্পকলার উপাদানগুলিরও এমন সব সত্তা রয়েছে, যাদের নিগূঢ় পরিচয় শিল্পীর স্বাচ্ছন্দের জন্য অত্যাবশ্যক।" [২১]

রবীন্দ্র-কাব্যভাবনাকে সমর্থন করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। পদ্য-কবিতার ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ শাসন ভেঙে, সলজ্জ অবগুণ্ঠন দূর করে কবিকে হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন আর চিত্র-শিল্পীকেও হতে হবে স্বচ্ছন্দবিহারী তবেই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্প হয়ে উঠবে শিল্পোত্তীর্ণ। মূলত কবি ও চিত্রী উভয়েরই সৃষ্টির স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয় বলে লেখক মনে করেন।

রণেশ দাশগুপ্ত নজরুল-কাব্যের গতিশীলতা মূল্যায়ন করেছেন। বাংলা সাহিত্যকে প্রবন্ধকার প্রবহমান নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নদীর মতো সাহিত্যেরও একটা প্রবহমানতা রয়েছে। রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। তবে সৃজনশীলতার অভাবে এ সাহিত্যও স্রোতবিহীন নদীর ন্যায় প্রবহমানতা হারাতে পারে। যাকে রণেশ দাশগুপ্ত 'মরা গাঙ' বলে অভিহিত করেছেন এবং সৃজনশীলতার ব্যাপকতাকে 'গহীন গাঙ' বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'নজরুল-কাব্য প্রবাহের জঙ্গম বিচার' প্রবন্ধে উল্লেখ আছে :

---

২০. প্রাগুক্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা) ; পৃ. ৮
২১. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : ছবি ও কবিতার শাসন প্রশ্রয়) ; পৃ. ৯০ ও ৯১

Dhaka University Institutional Repository

> "নজরুল কাব্যের বিভিন্ন দিক পূর্ব বাংলার নদী প্রবাহের স্বভাব বিশিষ্ট। আমরা এর জঙ্গম রূপকে আবিষ্কার করেছি। যদি সে ছবি হয়েও থাকে, তবে সে ছবি চলমান, ধাবমান, বহমান, চঞ্চল। --- এই কাব্যে যেমন মরা গাঙ আছে, তেমনি আছে গহীন গাঙ।"[২২]

নজরুল-কাব্য বাংলা কাব্য-প্রবাহের চিরকালের সঞ্জীবনী ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। রণেশ দাশগুপ্ত নজরুলের কাব্য-ভাবনার উপর আরও ৩টি প্রবন্ধ লিখেছেন- 'গিরিফুল,' 'নতুন স্মৃতিতে আরোহণ,' 'অব্যাহত অবিভাজ্য অপরিহার্য প্রতিনিয়ত নজরুল।"

'গিরিফুল' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বলতে চেয়েছেন বাংলা কাব্যাঙ্গনে নজরুলের আবির্ভাব গিরিমল্লিকার অগ্নিমালা গলায় পরে। নজরুলের গিরিফুলই স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যিক মন নিয়ে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে বাংলা কাব্যাঙ্গনে আবির্ভূত। তিনি বলেছেন :

> "গিরিফুলই কি স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ কাব্যিক মন ও পরিবেশের মাধুর্যে সঠিক সৌন্দর্য-প্রতীক হিসেবে বাংলা-কাব্যের নতুন রূপ-সজ্জার সূত্রপাত করেনি ? ঠিক সেই প্রলয়ংকর সময়ে অন্য কোন ফুলের পক্ষে কি সম্ভব ছিল সৌন্দর্যকে স্পর্ধাভরে নবযুগান্তরে পৌঁছে দেওয়া ?" [২৩]

নজরুলের কবিতা 'দুর্গম গিরিকান্তার মরু'-র যাত্রীর সঙ্গে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। 'গিরিফুল'কে লেখক নজরুল-কাব্যের বিশিষ্ট সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। 'গিরিফুল' বাংলা কবিতা বিকাশে শুধু মাত্র নতুন উপকরণ হিসেবেই সংযোজিত হয় নি, বরং এ 'গিরিফুল' বাংলা কবিতার নব-সৌন্দর্য ও নব-বিচারেও পথ দেখিয়েছে।

প্রবন্ধকার নজরুলের সঙ্গে ফরাসী কবি পল এলুয়ারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। উভয়েই নিপীড়িত মানুষের কবি। তবে নজরুলের মধ্যে রয়েছে দৃপ্ত ঘোষণা আর এলুয়ারের মধ্যে আছে মৃদু গুঞ্জন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর এলুয়ারের কবিতা হয়ে উঠেছে নজরুল-ধর্মী প্রতিবাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠ। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'নতুন স্মৃতিতে আরোহণ' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে :

---

২২. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : নজরুল-কাব্য প্রবাহের জঙ্গম বিচার) ; পৃ. ৯৪
২৩ প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : গিরিফুল) ; পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

> "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রকাশিত পল এলুয়ারের কাব্যগ্রন্থ এবং বিশেষ করে তাঁর 'অব্যাহত কবিতা' পড়ে মনে হয়েছে, এ যে ঘোষণা ! পল এলুয়ারের দীর্ঘ অজস্রভাষী 'অব্যাহত কবিতা' পড়ে মনে হয়েছে, এ যেন নতুন ছাঁচে ঢালা 'বিদ্রোহী' কবিতা। বহু বিপরীত ভাবের অনর্গল সমাবেশ সত্ত্বেও নজরুলের 'বিদ্রোহী'র মতই পল এলুয়ারের 'অব্যাহত কবিতা' সহজবোধ্য। অব্যাহত কবিতার আঙ্গিকগত জটিলতা কবির বক্তব্যের হীরক দ্যুতিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এ বক্তব্য 'বিদ্রোহী' কবিতার মত তেজস্ক্রিয়। এ কবিতা দয়িতাকে নিবেদিত হলেও বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতা ও শান্তিকামী মানব-মানবীর জন্য উচ্চারিত।" [২৪]

সময়ের প্রয়োজনে যে-কোন কবি তাঁর কবিতার ধারা পরিবর্তন করতে পারেন। তাই মৃদু-গুঞ্জনের কবিও সময়ের দাবিতে বিদ্রোহী হতে পারেন। পল এলুয়ারের এই বিদ্রোহী মানসিকতাকে নজরুলের বিদ্রোহের সঙ্গে এক করে ভেবেছেন প্রবন্ধকার।

প্রবন্ধকার নজরুলের অব্যাহত ও অবিভাজ্য সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর 'অব্যাহত অবিভাজ্য অপরিহার্য প্রতিনিয়ত নজরুল' প্রবন্ধে। নজরুলকে কেউ কেউ বিভাজন করে দেখেছেন। রণেশ দাশগুপ্তের মতে নজরুলের সত্তা অবিভাজ্য এবং চেতনা অব্যাহত। এখনও তাঁর সাহিত্যাদর্শ ধারাবাহিকভাবে লালিত ও আদৃত হয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি :

> "পঞ্চাশের দশকেই শুরু হয়েছে নজরুলের কাব্যিক গুণগত উৎকর্ষ ও সামগ্রিকতা বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পালা। --- নজরুল-কাব্যের গুণগত উৎকর্ষ এবং তাঁর সমগ্রসৃষ্টির অবিরত প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকা মহল থেকে খোঁজ-খবর শুরু হয়ে যায়। --- এই ধারা এরপর পঞ্চাশের দশক থেকে এ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।" [২৫]

কবি হিসেবে নজরুলের গণচেতনা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। নজরুলের কাব্য-প্রবাহ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি ; তাঁর চেতনা প্রতিনিয়ত প্রাত্যহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

উপমহাদেশের সর্বস্তরের মানুষ ; মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, কৃষক ও নারীসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এক সঙ্গে বিন্যস্ত করার মত সাহস নজরুলের ছিল। জাতীয় স্বাধীনতা, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি, সাম্য ও সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন আপোসহীন সংগ্রামী।

---

২৪. প্রাগুক্ত, আলো নিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : নতুন স্মৃতিতে আরোহণ) ; পৃ. ১০৭

২৫. প্রাগুক্ত, আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (প্রবন্ধ : অব্যাহত অবিভাজ্য অপরিহার্য প্রতিনিয়ত নজরুল) ; পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

কোন পরাশক্তি নজরুল-কাব্যের বিপ্লবী গতিকে শ্লথ করতে পারে নি। নজরুলের এ চেতনাকে রণেশ দাশগুপ্ত মার্কসীয় চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

সমাজ এবং সমাজের শ্রমজীবী মানুষের কথা রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে তিনি মানবতাবাদী, সমাজবাদী আদর্শ কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যাদর্শ আলোচনার পাশে নির্যাতিত মানুষের কবি সুকান্তের কাব্য-বৈশিষ্ট্য, কবি-স্বভাব ও শ্রমজীবী মানুষের সমষ্টির ভাবনাকে মূল্যায়ন করেছেন 'সুকান্ত-নিকষিত হেম' প্রবন্ধে ; যেখানে মানুষকে বড় করে দেখা হয়েছে। জীবন সত্য, মানুষ সত্য এবং 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ বোধই রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-চিন্তার মুখ্য বিষয়। তিনি বলেছেন :

> "সুকান্ত সবসময় মৃত্যুর ছায়াতে বসে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। নিজের বিদায়ের বারতা শুনিয়েই বিপ্লবী নতুন মানবকে স্বাগত জানিয়েছেন। সে বার বার বলেছে যে, সে থাকবে না, যদিও জগৎ থাকবে, মানুষের বাসোপযোগী নতুন জগৎ থাকবে।" [২৬]

সুকান্ত মূলত মানুষকে ভালবাসতেন। এটাই সুকান্ত সম্পর্কে মূল কথা। তিনি নতুন মানুষকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাদের জন্যে রেখে যেতে চেয়েছেন মানুষের বাসোপযোগী সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা। সুকান্তের কবিতা মুলত নিপীড়িত গণমানুষের কবিতা। তাঁর কবিতায় মানুষকে বড় করে দেখা হয়েছে।

সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে, রণেশ দাশগুপ্তের চেতনালোকে ধরা পড়েছে সোভিয়েত কবি মায়াকভস্কি এবং চিলির কবি পাবলো নেরুদার জীবনাদর্শ। মায়াকভস্কি তাঁর চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সোভিয়েতসহ সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধ্রুপদী কবি হিসেবে খ্যাত। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি সমাজ থেকে শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার মূলোৎপাটন করে এক চিরশান্তিময় নতুন সমাজ গঠনে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন। মায়াকভস্কি সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন :

---

২৬. প্রাগুক্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : সুকান্ত-নিকষিত হেম) ; পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

> "শ্রমজীবীদের বিপ্লব সোভিয়েত দেশে একটা বহুকালের জনগণের ইপ্সিতকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে এবং সারা বিশ্বেই তা করতে যাচ্ছে - এই প্রক্রিয়াটি তাঁর কবিমানসে উদঘাটিত হয়েছিল। দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও যে অজস্র বিচিত্র অনন্য রূপ উন্মোচিত হচ্ছিল তাকে মনের পটে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না যেন। কিন্তু যে অসংখ্য মূর্ত রূপকল্প তাঁর মনে জেগেছিল, সেগুলিকে সীমাহীনভাবে সজাগ থেকে থেকেই ধরেছেন।" [২৭]

মায়াকভস্কি শ্রমজীবীর প্রাধান্য প্রকাশে তাদের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। মায়াকভস্কি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল, তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি ছিলেন খুবই সচেতন।

ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী কবি পাবলো নেরুদা। তাঁর কবিতায় শুধু জাতীয় মুক্তির বাণীই ধ্বনিত হয় নি বিশ্বময় শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ও ব্যক্ত হয়েছে। সংগ্রামী নেরুদা সম্পর্কে লেখকের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় :

> "বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক মানসের যে মৌলিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় ব্যাপক ও বিশাল বিপ্লবে নিয়োজিত এবং যার চালিকাশক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তার কাব্যের দিকটাকে এগিয়ে নিয়ে আসার কাজে পাবলো নেরুদা সামনের সারিতে থেকেছেন।" [২৮]

যুগে যুগে শোষণ-পীড়ন ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের সফলতা, ব্যর্থতা ও সম্ভাবনাকে পাবলো নেরুদা বিশ্বের পটভূমিতেই কাব্যের সূক্ষ্মতম অনুরণনের রূপ দিয়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এসে সাহিত্য-শিল্পকলায় শ্রমজীবীদের স্থান করে দিয়েছে। শ্রমজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মায়াকভস্কির কাব্যের মূলসুর। ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী কবি পাবলো নেরুদার কবিতায়ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। মায়াকভস্কি ও পাবলো নেরুদার শ্রেণি-সংগ্রাম এবং সমাজসচেতনতা রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর সাহিত্য-চিন্তায় গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

২৭. প্রাগুক্ত, আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (প্রবন্ধ : সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রথমপদী কবি মায়াকভস্কি) ; পৃ. ৫৩

২৮. প্রাগুক্ত, আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (প্রবন্ধ- পাবলো নেরুদা : অবিরত কাব্যকৃতি) ; পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর সাহিত্য-চিন্তায় জীবনানন্দ দাশকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। সাধারণের নিকট জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি, ধূসরতার কবি, নৈরাশ্যবাদী কবি হিসেবে অভিহিত হলেও রণেশ দাশগুপ্তের দৃষ্টিতে তিনি স্বদেশ ও প্রকৃতির মধ্যে মানবিক ও সমাজভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অন্ধকার ও মৃত্যুর কথা থাকলেও তিনি তাকে জীবনের পরম প্রাপ্তি মনে করেন নি। যুগ-যন্ত্রণার দ্বন্দ্বই তাঁর কবি- মনে আক্ষেপ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর অনেক কবিতায় শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

জীবনানন্দের কবিতা মন্থন করে রণেশ দাশগুপ্ত তুলে এনেছেন মার্কসীয় চেতনা। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র। 'আমি' ও 'আমরা' শব্দদ্বয় তাঁর কবিতায় বৃহত্তর আশাবাদী দ্যোতনায় ঋদ্ধ। যদিও জীবনানন্দ দাশ –

> "সমাজবিপ্লবের চাবিকাঠি হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি বোঝেনওনি, দেখতেও পাননি। কিন্তু মার্কসবাদীরা জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে সমাজ বিপ্লবের অন্যতম উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করবে। কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে লোভ ও নীচতাকে অতিক্রম করে মানুষের এগিয়ে চলার তাগিদ।" [২৯]

তাই শুধুমাত্র নৈরাশ্যবাদই নয়, জীবনের ইতিবাচক দিকও জীবনানন্দের কবিতায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বলে রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন।

রণেশ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তার বিপরীতমুখী দুটি সত্তার বিরোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিরোধের মূলে রয়েছে একদিকে ঈশ্বর অন্যদিকে মানবসত্তা। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'-তে ঈশ্বরসত্তা মুখ্য বিষয় হলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়নের একটি ইংরেজি ভাষ্য 'গার্ডেনার' গ্রন্থে মানুষই মুখ্য, পরমেশ্বর এখানে অনুপস্থিত। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ পরিক্রমা : খাদে নিখাদে' প্রবন্ধে। লেখকের উক্তি :

> "রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতে বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ ও সংসারযাত্রার প্রতিফলনের ছবিগুলো 'গীতাঞ্জলি'-তে অপ্রধান হয়ে কিংবা কিছু কিছু প্রতীকী ভাবনাতেই শুধু নিবদ্ধ ছিল, সেগুলি সোজাসুজি গার্ডেনারের মারফত সামনে এসেছিল। গীতাঞ্জলিতেও ঈশ্বরসত্তার পাশে পাশে মানবসত্তা গ্য

২৯. প্রাগুক্ত, (প্রবন্ধ : মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ) ; পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ঘেঁষে রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরসত্তাই প্রবল, প্রধান। গার্ডেনারের বিপরীতটাই ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে এখানে পরমেশ্বর অনুপস্থিত। সবার উপরে মানুষ সত্য, জগৎ সত্য।" [৩০]

রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৪৬ নং পত্রের মাধ্যমে বেদান্ত রচয়িতা ও ব্যাখ্যাকারদের ঈশ্বর ও সৃষ্টিতত্ত্বকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের প্রবন্ধে উল্লেখ আছে :

"রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পড়ার আগেও বেদান্তের সৃষ্টি সম্পর্কিত মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল তাঁর মনে। রামমোহনের বই পড়ে তাঁর সংশয় কাটেনি। তিনি সৃষ্টি বা বিশ্বপ্রকৃতিকে ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি এই অবস্থান থেকে কোনক্রমেই নড়বেন না বলে জানিয়েছেন।" [৩১]

বেদ-উপনিষদের ধর্মীয় পারিবারিক পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং এর পরিচর্যা আজীবন থাকলেও রবীন্দ্রচিত্তে একটা বিরোধী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল।

কল্লোলীয় লেখকবৃন্দ রবীন্দ্র-সাহিত্যভাবনার বিরোধিতা করলেও রণেশ দাশগুপ্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যে লক্ষ্য করেছেন মৃত্যুকে জয় করার দৃঢ় প্রত্যয়। '১৪০০ সাল', 'বসুন্ধরা' ও 'পৃথিবী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন এবং 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা' নাটকে মৃত্যুঞ্জয়ী নায়ক চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে জীবনের প্রতি ভালবাসা ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে বলে রণেশ দাশগুপ্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। যেখানে তিনি বলেছেন :

"মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে সজীব ও সচল বলেই মনে করবো। মার্কসবাদে দ্ব্যর্থহীনভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা আছে। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে চায়, মানবসমাজের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠিগত সৃজনশীলতা অতীতের আবরণ ভেদ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল উপাদানগুলি রসায়িত ও জারিত হয়ে মৃত্যুকে সবসময় ডিঙ্গিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন বিপ্লবী প্রতিভার মৃত্যু নেই। মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত পথের নিশানা। মুক্তিসংগ্রামীর গলায় যে জয়ের মালা দোলে, তা কোন দিন বাসি হতে পারে না। কারণ, মুক্তিসংগ্রামী যে মালা দিয়ে যায়

---

৩০. প্রাগুক্ত, (প্রবন্ধ- রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ পরিক্রমা : খালে নিখাদে) ; পৃ. ১৩৩
৩১. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৩২ ও ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

> তার উত্তরপুরুষের গলায়। অব্যাহত জীবনস্রোতের মোকাবেলায় এখানেই মৃত্যুকেই মনে করা যেতে পারে অর্থহীন। অমরতার এই দর্শনকে সামনে রেখে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্ব বিচার করতে বসি, তাহলে তাঁকে নিয়ে নিরবধি কাল পর্যন্ত যেতে না পারলেও অনেকদূর যেতে পারব।" [৩২]

রণেশ দাশগুপ্ত এখানে রবীন্দ্র-সাহিত্য মূল্যায়নে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য দর্শন যে মার্কসবাদের বিপক্ষে নয়, রণেশ দাশগুপ্ত সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন উক্ত প্রবন্ধে।

সৃষ্টিমূলক সাহিত্য এবং তত্ত্বমূলক বা তাত্ত্বিক সাহিত্য নিয়েও রণেশ দাশগুপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ' গ্রন্থের 'মার্কসীয় বাতাবরণ: শতাব্দীকালের সাহিত্যে' প্রবন্ধে তার সাক্ষাৎ মেলে। সৃষ্টিশীল সাহিত্যালোচনায় তিনি ম্যাক্সিম গোর্কি, রাটোল্ড ব্রেখট, লু সুন, মায়াকভস্কি, হো চি মিন, পাবলো নেরুদা, আস্টুরিয়স, মার্কোয়েজ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ এবং তাত্ত্বিক সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে গিওর্গী লুকাস, লুই আরাগঁ, র‍্যালফ ফক্স্ , ক্রিস্টোফার কডওয়েল , আমিলিকার কাবরাল প্রমুখের সাহিত্য-ভাবনাকে বিবেচনা করেছেন। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে মার্কসীয় সূত্র ও বিপ্লবের বাতাবরণকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে তার সূত্র-সন্ধান করা হয়েছে।

> "মার্কস কিংবা বিশিষ্ট মার্কসবাদীদের অথবা এঁদের লেখা কোন বিশেষ বই বা সূত্রের উল্লেখ থাকা-না-থাকা নিয়ে কোন সাহিত্যের কাজের মূল্য যাচাই করা উচিত নয়। মার্কসের অথবা তাঁর লেখার কোন উল্লেখ থাকলে যেমন বাড়াবাড়ি করে দেখা ঠিক নয়, তেমনি না থাকলে সেই সাহিত্যের কাজ মার্কসীয় বাতাবরণের বাইরে পড়ে যায়না।" [৩৩]

সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্তের মুক্ত চিন্তার পরিচয় মেলে। কোন যান্ত্রিক প্রয়োগ কৌশলে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন রাখতে পারে নি। তিনি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', নজরুলের 'বিদ্রোহী', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত', মানিক

---

৩২. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : রণেশ দাশগুপ্ত মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ) ; পৃ. ১২৭

৩৩. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ- মার্কসীয় বাতাবরণ : শতাব্দীকালের সাহিত্যে) ; পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' প্রভৃতি গ্রন্থকে মার্কসীয় চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের বিভিন্ন ভাষার শিল্পী-সাহিত্যিকদের রচনা থেকে মার্কসীয়তত্ত্ব ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বাস্তবতা খুঁজতে গিয়ে পেয়েছেন মার্কসীয় বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণিসংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণের রচনায়ও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এসব লেখকদের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত শুধুমাত্র মার্কসীয় চেতনাই প্রত্যক্ষ করেননি বরং বাস্তব জীবনের এক চরম সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

> "বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির ধারার উল্লেখিত শিল্পীদের সাধনার ধারাটিও বিবেচনার দাবিদার। এঁরা সকলেই জীবনশিল্পী হিসেবে জীবন-সত্যকে সমস্ত অন্তর ঢেলে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মন ছিল খোলা। শুধু বাস্তবের জন্যে নয়, সম্ভাবনার জন্যেও । --- আমাদের সাহিত্যের জীবনশিল্পীর বাস্তবের পাশাপাশি এই সম্ভাবনাকে বড় করে দেখিয়েছেন।" [৩৪]

সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্ত মার্কসীয় তত্ত্বান্ধ সমালোচকদের চেয়ে একটু আলাদা। তিনি শুধুমাত্র তত্ত্বাদর্শ ও বাস্তব-সত্যকেই মূল্যায়ন করে নি, বরং সৃষ্টিশীল বাস্তববাদী জীবন-শিল্পীদের সম্ভাবনাকেও অনুসন্ধান করেছেন।

'গণসাহিত্যের ধারা বিচার' প্রবন্ধে লেখকের যে ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তা হলো-গণপ্রেরণা না পেলে গণসাহিত্যের সৃষ্টি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। গণজীবনের সবটা না জানা পর্যন্ত লেখক তাঁদের চিত্র তুলে ধরতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি :

> "গণসাহিত্য যেন একটা এলাহি কর্মকাণ্ড যা বর্তমানে সাধ্যাতীত একটা কবিতা, একটা গান, একটা গল্প বা উপন্যাস বা নাটক ওজনে ভারী না হওয়া পর্যন্ত যেন গণপ্রচারের অধিকারী হতে পারে না। গণজীবনের সবটা না জানা পর্যন্ত যেন জনতার কাছে জনতার ছবি নিয়ে যাওয়া যায় না।" [৩৫]

---

৩৪. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৭

৩৫. (সম্পাদকের নাম উল্লেখ নাই), অমর একুশের সংকলন (একুশের সংকলন, গৌরিক, ৭১ থেকে গৃহীত), (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'গণসাহিত্যের ধারা বিচার'), ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

জনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে গণসাহিত্য সৃষ্টি করা যাবে না। লেখকের এ জন্যে গণ-সংযোগ অত্যাবশ্যক। তাহলেই সাহিত্যে গণচিন্তার প্রতিফলন ঘটবে।

গণসাহিত্য সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্তের অপর যে ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে তা হলো- গণসাহিত্য এখন পর্যন্ত তার সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে মুক্ত হতে পারেনি। চিরায়ত সাহিত্যের অভ্যন্তরে গণসাহিত্য তার প্রস্তুতি চালিয়েছে অতি সন্তর্পণে। লেখকের ভাষায়,

> "এখনও গণসাহিত্য রয়ে গিয়েছে, চিরায়ত সাহিত্যের ভাঁজে ভাঁজে।" [৩৬]

ষোল আনা গণসাহিত্য সৃষ্টির অপেক্ষায় না থেকে, এখন থেকেই গণসাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন। তা না হলে গণসাহিত্যের বিকাশ সম্ভব নয়।

সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্ত নাটককেও বাদ দেন নি। তিনি নাটককে দেখেছেন গণমুক্তির সংগ্রাম হিসেবে। নাটকে সমাজের সমস্যা প্রতিফলিত হওয়া উচিত বলে রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন। এ ক্ষেত্রে নাট্যকারদের নাটক রচনায় গণমানুষের দাবিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ গণমানুষের ছবি ফুটে উঠবে নাটকে।

'গণনাট্যের প্রয়োজনে' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত কিছু নিজস্ব মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে গণমুক্তির সংগ্রামের পটভূমিতে কি ধরণের নাটক রচিত হওয়া আবশ্যক আজও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কৃষক, মজুর, মেহনতি মানুষের কথা অলক্ষ্যেই থেকে গেছে। নাটক জনমনের চিন্তার গভীরে স্পর্শ করতে না পারলে তা সফল হয় না। প্রবন্ধকার নাট্য-আন্দোলন প্রসঙ্গে বাংলা নাটকের গতি-প্রকৃতি নিয়েও পর্যালোচনা করেছেন। নাটকে গণমানুষের প্রতি লেখক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> "লেখা থেকে শুরু করে নাট্যাভিনয়ের সমস্ত কিছু নিয়ে যে নাটক, তাতে প্রস্তুতির সময়েই শিল্পীদের মনে রাখতে হবে গণমন ও গণজীবনের সহজ সরল সাড়া দেবার উপাদানগুলিকে। এটা সহজ কাজ নয়। একই সঙ্গে ব্যাপকভাবে জনমনের সঙ্গে সংযোগ সাধন এবং শিল্পমানের উৎকর্ষ সাধন অবশ্য করণীয় হলেও তা সময় সাপেক্ষ্য অথচ অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে নাট্যানুষ্ঠান করার দরকার হতে পারে। কোন কোন সময় দেখা যাবে, এ তাড়াহুড়োর দরুন প্রস্তুতির অভাবেই গণজীবনের তারে ঠিকমত ঘা দিতে না পারায় নাটক মার খেয়ে গেল।" [৩৭]

---

৩৬. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১১৮

৩৭. মহসিন শস্ত্রপাণি ও যোসেফ শতাব্দী (সম্পাদক), ফাল্গুনের আর্ট (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'গণনাট্যের প্রয়োজনে'), ১৯৭০, উন্মেষ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ ; পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

'বিজন ভট্টাচার্য' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত বরেণ্য বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের গণনাট্য আন্দোলনের বিপ্লবী চেতনাকে তুলে ধরেছেন। বিজন ভট্টাচার্য শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণিগত অভ্যুত্থানকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, যার মাধ্যমে শোষণ, ক্রন্দন ও অন্ধত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব বলে তিনি মার্কসীয় দর্শন থেকে জেনেছিলেন। এ আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি রচনা করলেন এক অসামান্য নাটক 'নবান্ন'। এ নাটকের বিষয়বস্তু তেরশো পঞ্চাশের বাংলার মন্বন্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান। এর আহ্বান দারিদ্র্য-পীড়িত মেহনতি মানুষকে একত্রীকরণের আহ্বান। লেখক বলেছেন,

> "এই প্রতিরোধ বাংলা নাটকের মূল ধারার প্রকাশ। পড়ে যাওয়া দূর থাক, আগামী একশো বছরে 'নবান্ন' দর্শকমণ্ডলীকে মানুষের জন্যে মানুষের করণীয়কে এবং চিন্তনীয়কে জাগিয়ে রাখবে।" [৩৮]

বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের বিপ্লবী লোকায়তের উপকরণের সবচেয়ে বেশি অংশ সংযোজন করেছেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। অর্থাৎ সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্ত লোকজীবনের প্রভাবকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর উপন্যাস-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে উপন্যাসের তত্ত্ব ও প্রবণতা আলোচনার পাশাপাশি আঙ্গিকগত ও রূপগত পরিচর্যা নিয়েও ভেবেছেন। ফর্স্টর উপন্যাসে যে পাঁচটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন তা হলো গল্প, আখ্যান, চরিত্র, ফ্যান্টাসি ও রিদম। উপন্যাসে থাকবে বিষয়-বৈচিত্র্য ও বহুবর্ণিল শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত হবে উপন্যাস-ক্যাম্পাসে, আর মানবমন ও আচরণ সম্পর্কে থাকবে পর্যবেক্ষণ। উপন্যাস বিবেচনার ক্ষেত্রে এ ধরনের বহু মত রয়েছে। রণেশ দাশগুপ্ত একটি শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে বহির্বাস্তবের বিস্তৃতি, চরিত্রাবলির পরিপূর্ণতা ও লোকগদ্য ব্যবহারের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি উপন্যাসের শিল্পরূপ বিচারের ক্ষেত্রে বাস্তবতা, কল্পনা-প্রবণতা ও লোকজশব্দ ব্যবহার এ তিনটি উপাদানের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি দেশী-বিদেশী বহু উপন্যাস থেকে উক্ত তিনটি উপাদানের সার্থক প্রয়োগ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

---

৩৮. রণেশ দাশগুপ্ত, সাম্যবাদী উত্থান-প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা (প্রবন্ধ : বিজন ভট্টাচার্য) ; পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত উপন্যাস-শিল্পের মনোবাস্তববাদী ধারার ভবিষ্যত নিয়েও ভেবেছেন। উনিশ শতকের উপন্যাস-চরিত্রে ছিল গতিহীনতা। আর এ গতিহীন, নিশ্চল চরিত্রে বহুমাত্রিক চেতনা-প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে বিশ শতকের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ছোঁয়ায়। এখানে চরিত্র হয়ে উঠেছে গতিশীল, দ্বান্দ্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী। উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় চেতনার মনঃসমীক্ষণের একমাত্রিক প্রয়োগের নেতিবাচক দিকটি দূর করে কীভাবে ইতিবাচক বিকাশকে সম্ভাবনাময় করা যায় রণেশ দাশগুপ্তের চিন্তায় তা বিদ্যমান ছিল।

আন্তর্জাতিক উপন্যাস-সাহিত্য বিশ্লেষণে রণেশ দাশগুপ্তের অনুসন্ধানী মন সক্রিয় ছিল। উপন্যাসের রূপগত ও নন্দনতত্ত্বের আলোকে উপন্যাসের সংকট নির্ণয় ও সংকট মোচনের নির্দেশনা রয়েছে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক পরিবর্তিত হওয়া উচিত বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। এই বিষয়ে তাঁর ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে 'উপন্যাসের শিল্পকলাগত মূলসূত্র' প্রবন্ধে। যেখানে তিনি বলেছেন :

> "বিশ শতকে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে চলেছে, সেটাও বাস্তবের গুণগত পরিবর্তন। শিল্পকলাতে তথা উপন্যাসে এই গুণগত বিপ্লবের বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি ঘটবে। ঘটেছে ইতিমধ্যে।"[৩৯]

উপন্যাস গতিশীল সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসও তার রূপ বদল করে। প্রসঙ্গত প্রবন্ধকার বলতে চেয়েছেন যে, সঙ্গীত ও কবিতা থেকে উপন্যাস আলাদা বলে তার শিল্পকলার সূত্রগুলোও আলাদা ধরণের। তাঁর মন্তব্য :

> 'কবিতা ও উপন্যাস উভয়েই ধ্বনিভিত্তিক। এ-সব ধ্বনি থেকে জাগে বহির্বাস্তবের এবং অনুভব-তরঙ্গের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি। তবে কবিতার ক্ষেত্রে অনুভব -তরঙ্গ সংঘটিত হয় ভাষার আকৃতিতে, উপন্যাস ক্ষেত্রে তা সংঘটিত হয় বহির্বাস্তবের চিত্রণে। সঙ্গীত, কবিতা এবং উপন্যাসে ধ্বনি-প্রতীকের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। উপন্যাসের ধ্বনি-প্রতীক হচ্ছে বহির্বাস্তবে অবস্থিত বিষয়বস্তুর প্রতীক ; কবিতার ধ্বনি-প্রতীক অনুভব-তরঙ্গ ও স্মৃতি-চিত্রের শব্দপদজাত জটিল মানসের প্রতীক।' [৪০]

---

৩৯. প্রাগুক্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : উপন্যাসের শিল্পকলাগত মূলসূত্র) ; পৃ. ৬৬
৪০. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৫৮ ও ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্ত সঙ্গীত ও কবিতাকে উপন্যাস থেকে আলাদা করে দেখেছেন। কারণ উপন্যাস বিষয় ও ভাবের দিক থেকে কবিতা ও সঙ্গীতের সমগোত্রীয় নয়। তাঁর মতে প্রতিটি বিষয়ই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

উপন্যাস-সাহিত্যেও গণমানুষের উপস্থিতি কামনা করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধে এ চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে ব্যক্তি-চিন্তা এবং নায়ক-নায়িকার কথাই প্রধান হয়ে ওঠে। 'বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে জনচেতনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নির্বাচনের ব্যাপারেও মেহনতি জনসাধারণকে প্রাধান্য দিয়েছেন প্রবন্ধকার। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> "এখন উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তার করছে জনসাধারণ। --- এখন ইতিহাসের মূল নায়ক হয়েছে মেহনতী জনসাধারণ। মেহনতি জনসাধারণের লোকই হবে এখন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা।" [৪১]

অতি সাধারণ, মেহনতী মানুষকে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে লেখক পক্ষপাতি।

'শিল্প-সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা' প্রবন্ধেও সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে জনগণের গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'অদৃশ্য জনতা' শীর্ষক প্রবন্ধেও শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অদৃশ্য জনতার উপস্থিতি কামনা করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রেও জনগণের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। 'জয় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তার পরিচয় মেলে।

এ ছাড়াও 'সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণের মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নে', 'মেহনত শক্তি ও প্রত্যয়', 'আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ', 'ছবি গণদর্শক ও মেহনত' প্রবন্ধেও জনতাপ্রবণতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ রণেশ দাশগুপ্তের দৃষ্টিতে জনতা, মেহনতি মানুষ ও মানবতার বিষয়টি সাহিত্যে উপেক্ষা করার নয়।

রণেশ দাশগুপ্তের মতে, উপন্যাস ইতিহাস নয়, সমাজতন্ত্রের তত্ত্বপাঠও নয় ; উপন্যাস-চরিত্র অভ্যন্তরে থাকবে সমকালীন সমাজচিত্র। উপন্যাসে আলোচনা চরিত্র-নির্ভর না হয়ে তা বিকাশধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন চরিত্রকে রণেশ দাশগুপ্ত গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে :

---

৪১. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস) ; পৃ. ৫২ ও ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

"উপন্যাস হিসেবে তার সার্থকতা সমাজজীবনকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তোলায়। যে কোন সময়েই হোক না কেন, বিশিষ্ট একটা বিশেষ ছবির মত, ভীড় থেকে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শক্তি ও চরিত্রের সমন্বয়ে। সমাজের কর্মধারা ও মানসিকতাকে একটা কাহিনীর মধ্যে শিল্পরূপ দেওয়া সম্ভব বিভিন্ন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে। তবে তাদের মেশানো দরকার।" [৪২]

অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয় বরং বহু চরিত্রের সমন্বয়ের মাধ্যমে উপন্যাস সৃষ্টিতে রণেশ দাশগুপ্ত পক্ষপাতি।

রণেশ দাশগুপ্ত উপন্যাসে সামগ্রিক জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হওয়া অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে উপেক্ষা করে সমাজ ও জনজীবনের বাস্তবতার আলোকে উপন্যাস রচনা করার পক্ষে। এ প্রসঙ্গে ড. সৌমিত্র শেখর মনে করেন :

"পরিব্যাপ্ত জীবনের সচালচিত্রের সুচারু উপস্থাপনা ঘটে উপন্যাসে। সাহিত্যের শিল্প-মাধ্যমগুলোর সঙ্গে উপন্যাসের আন্তঃসংযোগ নিশ্চয়ই আছে ; তবে বিচ্ছিন্নতা না-থাকুক – বিভিন্নতাও রয়েছে। আর এ শিল্পটির রূপগত বিবর্তন তো ঘটছেই অনবরত। রণেশ দাশগুপ্ত বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন এই পর্যায়গুলো অনুসন্ধানের এবং এতদবিষয়ে তাঁর ব্যক্তি-মত প্রদান অতঃপর। --- বহির্বিশ্বের সাহিত্যরচয়িতা, বিশেষ করে তাঁদের রচিত উপন্যাস সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্তের আলোচনা মূল্যবান। ফ্লবেয়র ও মোপাসাঁকে সার্ত্রে তাঁর 'সাহিত্য কি' গ্রন্থে 'কায়েমী স্বার্থের তল্পীবাহক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। রণেশ দাশগুপ্ত এর সঙ্গে একমত পোষণ না করে দেখিয়েছেন কিভাবে উল্লিখিত দুজন মুক্ত মানবতার আবহাওয়াকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত রেখেছিলেন। সেই সঙ্গে সার্ত্রের উপন্যাসকেও অবশ্য তিনি বাতিল করে দেন নি। কারণ সার্ত্রের উপন্যসের – এক. সামাজিক বাস্তবতা ও শিল্পীর স্বাধীনতার সমন্বয় এবং পুনর্বিন্যাস ; দুই. মনেবাস্তবতা, বহির্বাস্তবতা এবং ভাবলৌকিকতার এক উন্নত পর্যায়ের ঐক্যে উত্তীর্ণ ; তিন. 'কাঁচের মতো স্বচ্ছ যা বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন' – এমন ব্যবহার – এই বৈশিষ্ট্য তিনটি উপন্যাস-শিল্পের মৌলিক সম্প্রসারণকে মদদ দেয়। রুশ উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, রণেশ দাশগুপ্ত র‍্যালফ ফক্সের বিশেষ অভিমতের সঙ্গে ক্ষেত্র-বিশেষে একমত যেমন হতে পারেন নি, তেমনি আবার রুশ উপন্যাস ডা. জিভাগো সম্পর্কে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায় বাতিল করে দিয়েছে। রুশ উপন্যাস সম্পর্কে ফক্সের মন্তব্য : 'যদিও এখনও মাত্র নতুন এবং অপরিণত'। রণেশ দাশগুপ্ত এই

---

৪২. প্রাগুক্ত ; পৃ. ৪৭ ও ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অভিমত মেনে নেন নি, বরং ফক্‌সের নভেল এ্যান্ড দ্যা পিপল্ গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে 'দ্বৈত বক্তব্য' আবিষ্কার করেছেন। --- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অভিমত : 'ফ্রয়েডীয় ভাবধারার প্রাধান্যের আমলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন উপন্যাস লিখেছেন, যার মধ্যে মার্কসীয় প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিংবা একথাও বলা যেতে পারে যে, মার্কসবাদের প্রভাব শিল্পীর মনে অন্তঃশীল ছিল।' মানিক-উপন্যাসের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত চরিত্রের জীবনযাপন বিশ্লেষণ করেই রণেশ দাশগুপ্তের এ মন্তব্য। আসলে মানব-সমাজে সংগ্রামশীলতা ও অগ্রবর্তী হবার মানবীয় কামনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।" [৪৩]

রণেশ দাশগুপ্ত শিল্পরীতির নিকট দায়বদ্ধ হতে চাননি ; তিনি দায়বদ্ধ থাকতে চেয়েছেন সমাজ, সমাজের মেহনতি মানুষ ও মানবিকতার কাছে। শিল্পের চেয়ে মানুষই তাঁর কাছে বড়। তাই সমাজ-মানুষের সমস্যা-সংকট আবিষ্কার এবং তা থেকে উত্তরণের চিন্তাই রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-ভাবনার মূলসুর।

রণেশ দাশগুপ্ত প্রগতিশীল মানুষ। সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রেও তাঁর এ প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা সক্রিয় ছিল। তাঁর প্রগতিভাবনা, অসাম্প্রদায়িকতা ও মার্কসীয় চেতনাকে লক্ষ করে সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন :

"প্রগতিভাবনায় সর্বদা ভাবিত ছিলেন তিনি। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অনুভব করেছেন একাত্মতা। শ্রমজীবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল সাহিত্যের ব্যাপারে এক ধরণের পক্ষপাত তাঁর ছিল। শোষণমুক্তির আদর্শকে সবসময় অঙ্গীকার করেছেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শোষণমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা, আধুনিক ভাবনা প্রভৃতি তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর সব লেখারই উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদী চিন্তা বা মার্কসীয় ভাবাদর্শকে নানাভাবে বিকশিত করে তোলা ও তার মহিমাকে প্রচার করা। সমাজের বৈষম্য, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লোক-অভ্যুত্থান প্রভৃতিকে তিনি সন্ধান করেছেন সাহিত্যের মধ্যে। শ্রমজীবী জনতা ও নিপীড়িত বৈষম্যপিষ্ট লোকসমাজকে অঙ্গীকার করে সৃষ্ট সাহিত্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণেই ব্যাপৃত থেকেছেন তিনি। --- সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা মার্কবাদী পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। কারো সাহিত্য বিশ্লেষণের সময় ওই লেখকের ব্যক্তিজীবন ও সমসময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা আনয়নের এ প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়।" [৪৪]

---

৪৩. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ (ড. সৌমিত্র শেখর রচিত প্রবন্ধ 'রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-ভাবনা') ; প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৯

৪৪. প্রাগুক্ত, (সৈয়দ আজিজুল হক রচিত প্রবন্ধ 'রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ সাহিত্য') ; পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

হায়দার আকবর খান রনো রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর মার্কসীয় সৌন্দর্য-তত্ত্বকে, ক্রিস্টোফার কডওয়েলের নন্দন-তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> "আমাদের দেশে রণেশ দাশগুপ্তের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান ইংরেজ কমিউনিস্ট লেখক ক্রিস্টোফার কডওয়েলের সঙ্গে তুলনীয়। --- শিল্প সাহিত্য দর্শন যে কোনো বিষয়েই তিনি লিখুন না কেন, তাঁর বক্তব্যের মূল সুর একদিকে ধাবিত ছিল, তা হল মেহনতি মানুষের মুক্তিসংগ্রাম। --- সমাজ বদলের সংগ্রামে সাহিত্য ও শিল্পকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলসও তা জানতেন। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সেতুং-এর বেশকিছু রচনা সত্ত্বেও এই দিকটি এখনও যথেষ্ট বিকশিত নয়। এই জায়গায় কাজ করেছেন অন্যান্যদের মধ্যে কডওয়েল। এই জায়গাতেই কাজ করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত।" [৪৫]

মার্কসীয় চেতনা অর্থাৎ শ্রেণিসংগ্রামকে রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্য-বিচারের অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কমিউনিস্টপন্থী লেখক ক্রিস্টোফার কডওয়েলের ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি মার্কস, লেনিন ও এঙ্গেলসের নীতিকে অনুসরণ করেছেন। রণেশ দাশগুপ্ত বিশ্বাস করতেন যে, শোষণমুক্তি তথা সমাজতন্ত্রই সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং মজুর শ্রেণি নিজের মুক্তির মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের মুক্তি ঘটাতে পারে। তাঁর মননে, কর্মে ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে যে চেতনার জাগরণ ঘটেছিল তা হলো শ্রমিকেরা যে পথ গড়ে যাচ্ছে তা আলোকিত করে তোলার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের। শ্রমিকশ্রেণি ও বুদ্ধিজীবী উভয়েরই দায়িত্ব হয়ে পড়েছে নতুন সমাজ গড়ার। রণেশ দাশগুপ্তও সমাজ বদলের জন্যে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য-ভাবনায় সমাজ বদলের কথা, শ্রমজীবী মানুষের কথা এসেছে। তিনি যেহেতু বামপন্থী রাজনীতিবিদ সেহেতু রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি কার্ল মার্কসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। সাহিত্য-ভাবনার ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তা এ মার্কসীয় চেতনাকে অতিক্রম করে নি। সাহিত্যের বিবেচনায় শিল্প-ভাবনা তাঁর চেতনায় মূখ্য হয়ে ওঠেনি যতটা বিবেচিত হয়েছে রূপচিন্তা ও নন্দনচিন্তায়।

---

৪৫. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), (হায়দার আকবর খান রনো রচিত প্রবন্ধ 'রণেশদাকে যেমন দেখেছি'), প্রাগুক্ত; পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্প-চিন্তা

প্রবন্ধের বিষয়কে শিল্পাঙ্গিকে প্রকাশ করার মধ্যেই প্রবন্ধের শিল্পরূপ নির্ণিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধের বিষয়, বৈশিষ্ট্য, প্রকরণভাবনা ও তথ্যবহুলতাও বিবেচ্য বিষয়। পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশে যখন প্রবন্ধ-সাহিত্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সাহিত্যিকধারা হিসেবে বিবেচিত, তখন রণেশ দাশগুপ্ত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য সমালোচনার একটি বিশেষ ধারাও সূচনা করেন তিনি। তবে শিল্প-চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় আঙ্গিকগত দিকটি মুখ্য হয়ে ওঠে নি বরং বিষয় ও জীবন-সম্ভাবনাকেই তিনি মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

রণেশ দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯) গ্রন্থটি উপন্যাসের তত্ত্বালোচনা সম্বলিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। তিনি দেশী-বিদেশী মার্কসবাদী উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসে শিল্পরূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সাধারণভাবে উপন্যাসের শিল্পরূপ বিবেচনার ক্ষেত্রে -

> "রূপক, প্রতীক, ফ্যান্টাসি এবং স্যাটায়ার উপন্যাসের শিল্পরীতির এক আবহমান ধারা। শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি আঙ্গিকেই শিল্পীর অভিপ্রায় অনুসারে উল্লেখিত রীতিসমূহের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।" [১]

কিন্তু রণেশ দাশগুপ্ত এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁর নিকট উপন্যাসের রূপক, প্রতীক, ফ্যান্টাসি, স্যাটায়ার গুরুত্বহীন বিবেচিত হয়েছে। উপন্যাসের বিষয় বা বক্তব্যকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দেশী-বিদেশী উপন্যাস পাঠ করে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে লক্ষ করেছেন যে, সৃজনশীল শিল্পী কোন দিন প্রচলিতের পুনরাবৃত্তি করে না, পাঠক-পাঠিকার রুচি অনুযায়ী শিল্পরূপ বদলে যায় এবং নতুন বিষয়বস্তু নতুন প্রকাশভঙ্গি দাবি করে।

সমকালীন জীবনের অবিশ্রান্ত বাস্তব বিষয়কেই উপন্যাসে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। রণেশ দাশগুপ্তের মতে :

---

১. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ; পৃ. ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

"উপন্যাস যে হাসিখেলা নয়, এটা যে সত্যের অস্ত্র, এটা যে জীবনের বিপ্লবী দর্শন।" [২]

উপন্যাসের শিল্প-চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর এ বোধ-টুকু কাজ করেছে। এ ছাড়াও তিনি উপন্যাসে বাস্তবতার পাশাপাশি কল্পনাপ্রবণতা ও লোকজশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ডিফোর সাহিত্য-চিন্তা তথা উপন্যাসে বাস্তবজীবন বা সত্য ঘটনাকে উপস্থাপিত করার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন :

> "ডিফোর ক্ষেত্রে দেখা গেল, তিনি সবসময়ে পাঠক-পাঠিকার কানে কানে বলছেন, 'সত্য ঘটনা --- আমি নিশ্চয় করে বলছি তোমাকে।' সকলেই চায় অবিকল প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকা চায়, গ্রন্থ তাদের টেনে নিক নিজের মধ্যে এবং এ ব্যাপারটা সম্পন্ন হোক ভালভাবে।" [৩]

উপন্যাস-চরিত্রে রণেশ দাশগুপ্ত দ্বৈত সত্তা কামনা করেছেন - বাস্তববাদ ও ভাববাদ। চরিত্রে রোমান্টিকতার আতিশয্য তিনি বর্জন করতে চেয়েছেন। অতি রোমান্টিক ভাবাকুলতা চরিত্রকে বাস্তবাতীত করে তোলে। তবে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান লেখকদের হাতে রোমান্টিকতা যদি ইতিবাচক মাত্রা পায় সে ক্ষেত্রে চরিত্র হয়ে ওঠে বীর্যবান ; যেমন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অমিত পুরোপুরি রোমান্টিক চরিত্র হয়েও ব্যক্তিময়তায় সুগঠিত। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্তের উদ্ধৃতি লক্ষযোগ্য :

> "গ্যেটের 'ভের্থেরের দুঃখ' উপন্যাসের তরুণ নায়ক ভের্থেরের মানবীয় সত্য সন্ধানের মূল ভান্ডার যেমন হোমারের 'ইউলিসিস' বা 'ওডিসি' মহাকাব্য, তেমনি সমস্ত অনুভূতি- প্রবণতার মধ্যেও সজাগ রয়েছে দৃঢ় সংবদ্ধ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও চারিত্র্যিক বৈশিষ্ট্য যাদের নেই তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা।" [৪]

তাই রোমান্টিক চরিত্রটি যদি দৃঢ় বা ব্যক্তিময়তায় সুগঠিত হয়ে ওঠে, সে ক্ষেত্রে রোমান্টিকতা উপন্যাসে সংকট সৃষ্টি করে না বলে তিনি মনে করেন। মনোবাস্তববাদী ধারায় উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে বেগম আকতার কামাল লিখেছেন :

---

২. রণেশ দাশগুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ, ১৯৫৯, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭৩, কাকলী প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ; পৃ. ৫

৩. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : তিনটি উপাদান) ; পৃ. ১২

৪. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মানব চরিত্রের দ্বৈত সত্তা) ; পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

> "উপন্যাসের শিল্পরূপে মনোবাস্তববাদী ধারার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত সচেতন। উনিশ শতকীয় উপন্যাস যেসব স্থিতিস্থাপক চরিত্র গঠন করেছিল তারা ছিল এক-একটি গতিহীন, নিশ্চল রূপের বিম্বমাত্র। কিন্তু বিশ শতকীয় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস মানুষের আত্মাকে করেছে গতিবহ, দ্বান্দ্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী ; আত্মিক গতিই উপন্যাসে মনোলীলা সঞ্চার করে বিয়োগাত্মক তথা ঋণাত্মক সংকটের জটিলতা সূচিত করেছে। সর্বজনীন অন্তরাত্মার লীলাস্রোতে ভাসমান আদিম স্মৃতিপুঞ্জ ব্যবহারের অতিশায়িত চাপ উপন্যাসের চরিত্রকে ভ্রষ্ট ও অণুতে বিভক্ত করে ফেলে।" [৫]

উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় চেতনার একমাত্রিক প্রয়োগ উপন্যাস ও তার চরিত্রকে সংকীর্ণ করে। এ চেতনা থেকে মানবমনে একটি বিশেষ চেতনার জন্ম দিয়েছে যা নর-নারীকে তাদের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ও আবেগক্রিয়ার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অবচেতনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি :

> "প্রগতিশীল ও বিপ্লবী শিল্পীদের তাই সমস্যা, উপন্যাসকে কি করে তাঁরা নিয়ে যাবেন নেতিবাচক প্রবণতাগুলি থেকে ছাড়িয়ে তার ইতিবাচক বিকাশকে সম্ভাবনা থেকে সার্থকতায় উত্তরিত করে।"[৬]

সার্থক উপন্যাসের সারসত্তা হচ্ছে বিকাশমান চরিত্র। রণেশ দাশগুপ্ত উপন্যাস-চরিত্রের গতিশীলতা ও প্রসারমানতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে,

> "অতি আত্মিক বা অতি-কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক উপন্যাসের পরিণতি সাংসারিক বাস্তব হিসেবে ট্র্যাজেডি বা ব্যর্থতা। বুনিয়াদি উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জীবনেও ব্যর্থতা হচ্ছে নিদারুণ সত্য, কিন্তু তার সদা গতিমান ও সদা প্রসারমাণ বাস্তবের সমগ্রতায় অগ্রগতির চিহ্ন এঁকে চলে আসছে।" [৭]

উপন্যাসের গতিশীল ও প্রসারমাণ চরিত্র সমন্বয়ে উপন্যাস হয়ে ওঠে সজীব ও প্রাণবন্ত। জগৎ ও জীবনের সদা প্রসারমাণ ক্ষেত্রে নর-নারীর সংগ্রামী সক্রিয়তা উপন্যাসের শিল্পরূপকে বিকশিত করে।

---

৫. বেগম আকতার কামাল, বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প, (প্রবন্ধ : রণেশ দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' : পাঠসমীক্ষা), ২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ; পৃ. ১৬৭

৬. রণেশ দাশগুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ (প্রবন্ধ : মনস্তত্ত্বের বিয়োগাত্মক ধারা), প্রাগুক্ত ; পৃ. ৫৯

৭. রণেশ দাশগুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ (প্রবন্ধ : মানব চরিত্রের দ্বৈত সত্তা), প্রাগুক্ত ; পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্তের মতে, উপন্যাস শুধুমাত্র আকাশ-কুসুম ভাবনা বা যৌনদ্বন্দ্বের রসসমৃদ্ধ উপাখ্যান নয়। উপন্যাসে সমাজ-বিপ্লবের ভাবাদর্শ ও জনচেতনাকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তুলতে হবে। উপন্যাস-চরিত্র সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য :

> "উপন্যাস অবশ্য ইতিহাস নয়, সমাজতাত্ত্বিক সন্দর্ভও নয়। উপন্যাস হিসাবে তার সার্থকতা সমাজ জীবনকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তোলায়। যে কোন সময়েই হোক না কেন, বিশিষ্ট একটা বিশেষ ছবির মত, ভীড় থেকে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শক্তি ও চরিত্রের সমন্বয়ে। সমাজের কর্মধারা ও মানসিকতাকে একটা কাহিনীর মধ্যে শিল্পরূপ দেওয়া সম্ভব বিভিন্ন ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে।" [৮]

রণেশ দাশগুপ্ত বলতে চেয়েছেন যে, সমাজ, সমাজ জীবনের গতিশীল মানব চরিত্র বিকাশলাভের মধ্য দিয়ে উপন্যাস সার্থক হয়ে ওঠে।

মাতৃভাষা নিয়েও চিন্তা করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে বেশ কতগুলো প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অধিকাংশ প্রবন্ধেই তিনি মাতৃভাষাকে অবমূল্যায়ন না করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। আমাদের দেশে মাতৃভাষার ব্যাপক চর্চা প্রয়োজন এ-বোধটুকু রণেশ দাশগুপ্তের মধ্যে কাজ করেছে। 'ধ্বনি প্রতিধ্বনি' প্রবন্ধে তিনি মাতৃভাষা বাংলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমন মধুর সুললিত ভাষা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। বাংলা ভাষা, লোক-সঙ্গীত ও শ্লোগানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে প্রবন্ধকার বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন :

> "বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যে বাংলার মানুষের কথা বলার রেওয়াজের বৈচিত্র্যও ধ্বনিময়। রেলগাড়িটা যখন প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলে, তখন কামরায় বসে সুখ-দুঃখের আলাপ শুরু করলেই একটি শব্দ বিভিন্ন ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়ে মনে করিয়ে দেয় বাংলা ভাষা কত সহজ, কত সাবলীল। টানগুলি শুধু ভিন্ন, মধ্যকার মর্মভূমিটি ধরে রেখেছে কোটি কোটি মানুষের ঐক্যকে। --- যে ভাষার বোল এত মধুর ; যে ভাষাতে লোকসঙ্গীত এত আবেগশীল, যে ভষাতে কাঁদলে আত্মার প্রশস্তি মেলে, তার মর্যাদা তোরা দিলিনে।" [৯]

মধুর এ বাংলা ভাষা ও লোক-সঙ্গীতের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত বলে প্রবন্ধকার মনে করেন।

---

৮. রণেশ দাশগুপ্ত,আ.আ.দ্র(প্রবন্ধ : বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস) ; পৃ. ৪৭ ও ৪৮

৯. নূরুল ইসলাম ঢালী (সম্পাদক), উজ্জীবন (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'ধ্বনি প্রতিধ্বনি'), ১৯৭১ : পৃ. ১১ ও ১৩

Dhaka University Institutional Repository

'মাতৃভাষা ও কতিপয় বিবেচনা' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত যে কোন দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি মাতৃভাষার বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণপূর্বক এ ভাষার বিকাশ ও প্রসার কামনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> "যেসব দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক বা ব্যাপক পরিবর্তন আমাদের দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে, সেখানে মাতৃভাষা এই বিপ্লবে বা ব্যাপক পরিবর্তনে যে ভূমিকা পালন করেছে সেটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। --- সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙবার কাজে লাগিয়েই দেশ দেশান্তরে মাতৃভাষার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি। মাতৃভাষাকে ব্যাপৃত হতে হয়েছে নতুনতর রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বিপ্লব বা পরিবর্তন সাধনে।" [১০]

মাতৃভাষার বহুমুখী প্রয়োগের প্রতি প্রবন্ধকার বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এ প্রবন্ধে।

'মাতৃভাষা সাম্যের ভাষা' প্রবন্ধে প্রবন্ধকার যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন, তা হলো - এ ভাষা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভাষা। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি :

> "মাতৃভাষা যে কোন নরগোষ্ঠী বা জাতির সকলের। মাতৃভাষা এদিক দিয়ে সার্বজনীন। কিন্তু নরগোষ্ঠী কিংবা জাতির সামাজিক কাঠামোতে যদি বৈষম্য থাকে তবে মাতৃভাষা কোন বিশেষ কায়েমী স্বার্থবাদীর মুখের দিকে চেয়ে তাকে মেনে নিতে চায় না। মাতৃভাষা বরং যারা বঞ্চিত তাদেরই মুখের দিকে চায়। মাতৃভাষা চায়, মেহনতী মানুষের পক্ষে সামাজিক কাঠামোটা ঢেলে সাজানো হোক। ইতিহাসে যুগে যুগে বৈষম্যের বিরুদ্ধে, উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মানুষ যে, সংগ্রাম করেছে তাতে মাতৃভাষা হয়েছে সবচেয়ে বড় সহায়।" [১১]

এ ভাষা আমাদের অহংকার ; অমূল্য সম্পদ। এ ভাষা আমাদের সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গী। এ ভাষা আপামর জনগোষ্ঠীর। এ ভাষা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার ভাষা।

---

১০. হাসান ফেরদৌস (সম্পাদক), ভালবাসার বাগান থেকে (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'মাতৃভাষা ও কতিপয় বিবেচনা'), ১৯৭৩, মেঘদূত সংঘ ; পৃ. ৯ ও ১০

১১. মতিউর রহমান ভূঁইয়া (সম্পাদক), রক্তের সিঁড়ি বেয়ে (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'মাতৃভাষা সাম্যের ভাষা'), টি.সি.বি. কর্মচারী ও সাংস্কৃতিক পরিষদ ; পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্তের রচনাশৈলী অর্থাৎ তাঁর বাক্যগঠন, শব্দচয়ন ও বিষয়বস্তুর নান্দনিকতা সম্পর্কে সফিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন :

> "রণেশদার লেখায় ছিলো অনেক সূর্যের প্রত্যাশা, সমাজ-প্রগতির চাকাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ধাক্কা আর অজস্র নান্দনিক বৈভব। দীর্ঘ বাক্য তিনি লিখতেন না। ছোট ছোট বাক্য এক-একটি কাব্যিক শব্দ ও বাণীবিন্যাসে ভোরের সূর্যের মতো আভাময় হয়ে উঠতো। সাহিত্য ও শিল্পকলাকে রণেশদা বিলাসের সামগ্রী হিসেবে দেখেননি। শিল্পকলায় নান্দনিক ঐশ্বর্য ও শিল্পসৌকর্য থাকবে কিন্তু উদ্দেশ্যহীন হবে কেনো ? গোর্কির শিল্প সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য আছে– কিন্তু উদ্দেশ্য প্রধান হয়েও গোর্কির সৃষ্টি মহৎ শিল্পকর্ম। শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়েও শিল্পকর্ম উদ্দেশ্যহীন এ-তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।" [১২]

বাংলা সাহিত্যে পরিভাষার ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা কিভাবে বৃদ্ধি পাবে এ ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে তাঁর 'পরিভাষা কিভাবে জনপ্রিয় হবে' প্রবন্ধে। প্রবন্ধকারের মতে, দীর্ঘদিন ধরে যে সব ইংরেজি শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়ে আসছে তাদের বাংলা করার কাজও বহুদিন পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। এ পরিভাষা এখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠে নি। তাঁর ধারণা, আমাদের সামাজিক - রাজনৈতিক জীবনে এ ভাষার ব্যাপক বিস্তার না ঘটলে তা কখনই জনপ্রিয় হবে না।

কবিতায় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্ত লোকভাষা ব্যবহারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

> "কবিতার ভাষা মূলত মাতৃভাষা। এই মাতৃভাষারই অপর নাম সংশ্লিষ্ট কবির দেশ বা অঞ্চলের লোকভাষা।" [১৩]

কোন কবি-ই মাতৃভাষা বা লোকভাষা ছাড়া সার্থক কবিতা রচনা করতে পারেন না। কবিতায় ভাষা ব্যবহারের নিগূঢ় রহস্যটি নিয়ে রণেশ দাশগুপ্ত গভীরভাবে ভেবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মাতৃভাষা বা লোকভাষাকেই কবিতার সবচেয়ে উপযোগী ভাষা বলে মনে করেছেন। তিনি মাতৃভাষাকে কবিতার 'প্রাণ' বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে কবিতার ক্ষেত্রে রূপক, ছন্দ, উপমা,

---

১২. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), (সফিউদ্দিন আহমদ রচিত প্রবন্ধ 'স্মৃতিতে উজ্জ্বল এক বিপ্লবী পুরুষ'), প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৮৪

১৩. রণেশ দাশগুপ্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : কবিতা ভাষা মাতৃভাষা), প্রাগুক্ত ; পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও প্রতীকী-ভাবনা তাঁর কাছে মুখ্য নয় ; বরং কবির সমকালীন সমাজ, আর্থ-উৎপাদন কাঠামোতে কবিতার বিষয়বস্তুই তাঁর কাছে মুখ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মানবজীবন প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই বহমান। সে সমাজের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমাজে অধিকার-বঞ্চিত মেহনতি মানুষের জীবনই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রণেশ দাশগুপ্ত একজন সমাজসচেতন বামপন্থী রাজনীতিবিদ। স্বভাবত কারণেই শিল্প-চিন্তার ক্ষেত্রে রাজনৈতিকচেতনা প্রভাব ফেলেছে। তিনি ছিলেন মার্কসীয় চেতনার অনুসারী। তিনি একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট-কর্মীও ছিলেন। এ-কারণেই মার্কসবাদ তাঁর জীবন-ভাবনাকে ঘিরে রেখেছে। সমাজ থেকে শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার মূলোৎপাটন করে তিনি বিশ্বময় শান্তি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মার্কসীয় জীবনাদর্শকেই সমাজকল্যাণের সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-কামনা তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সমাজের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ টান ছিল। সমাজ থেকে শ্রেণি-বৈষম্য দূর করে সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার মানসিকতার মধ্যেই তাঁর শিল্প-চিন্তা নিহিত রয়েছে। তাঁর রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যেও রাজনীতির স্বরূপটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'নিজের মনের কাছে প্রশ্ন', 'ভাষা আন্দোলনের একটি মূল তাৎপর্য', 'গণমুক্তি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র', ও 'ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত' প্রবন্ধে বাঙালি জাতির রাজনীতি ও মুক্তি সংগ্রামের কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনই আমাদের গণতান্ত্রিক মুক্তির আন্দোলনের পথ দেখিয়েছে। আন্দোলনলব্ধ শক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন সে বিষয়টিই আলোচনায় মুখ্য হিসেবে গণ্য হয়েছে। প্রবন্ধের আঙ্গিক দিকটি নিয়ে ভাববার বিষয়টিই তাঁর নিকট মুখ্য ছিল না।

অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে দ্বিধা-বিভক্ত না হয়ে ঐক-মত্য হয়ে একই স্রোতের খাতে প্রবাহিত হতে পারে, সে বিষয়টি নিয়েই রণেশ দাশগুপ্ত গভীর চিন্তা করেছেন তাঁর 'একই স্রোতের খাতে' প্রবন্ধে। 'জনতার সংগ্রাম' প্রবন্ধেও ১৯৭১ সালে পাক-হানাদার কর্তৃক বাংলার মানুষ কিভাবে নির্যাতিত ও নিহত হয়েছে তার একটি জ্বলন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার। পাক-হানাদারদের অত্যাচারের চিত্রটিই এ প্রবন্ধে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় এ সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনার দাবি রাখে। রণেশ দাশগুপ্ত নিজেও ছিলেন সত্য ও সুন্দরের সাধক। তিনি কীট্‌স-এর সৌন্দর্যকে ধারণ করে বলেন :

> "সৌন্দর্যই সত্য আর সত্যই সৌন্দর্য এবং পৃথিবীতে এর উপরে জানবার মত আর কিছু নেই। --- মনে হয় কীট্‌স জানালায় কেউ যেন একগুচ্ছ তাজা ফুল রেখে গিয়েছে বাগান থেকে তুলে এবং কবি তা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছেন। আড়াই হাজারের মৃত্যু আর ধ্বংসের ইতিহাস এর সজীবতাকে ঝলসে দিতে পারেনি।" [১৪]

সৌন্দর্যের ক্রিয়া শাশ্বত ; তার মৃত্যু নেই। যা কিছু সত্য ও সুন্দর তাকে রক্ষা ও অনুসরণ করা উচিত বলে লেনিন যেমন মনে করতেন রণেশ দাশগুপ্তও তা বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর 'লেনিন, গোর্কি, গ্রামসি' প্রবন্ধেও সত্য ও সুন্দরকে ধারণ করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি লেনিনের সৌন্দর্যতত্ত্বকে তুলে ধরেছেন :

> "সঙ্গে সঙ্গে মার্কসপন্থী হিসেবেই সবসময় একথা মনে রাখতে হবে 'মানুষই মুক্তি বা পরিবর্তন ঘটাবার নায়ক' এই কারণেই আত্মিক বা মানসিক প্রস্তুতির ওপর লেনিন চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। --- 'সুন্দর যা তা' যদি পুরনো হয়, তবুও তাকে বাঁচাতে হবে, তাকে অনুসরণ করতে হবে।" [১৫]

রণেশ দাশগুপ্ত সমাজ পরিবর্তনে মানবশক্তিকে যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় চির-সুন্দরকে ধারণ করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এ সুন্দর ধরণীতে মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা তীব্র। কিন্তু মৃত্যু এসে তার সে স্বপ্ন ধুলিসাৎ করে দেয়। তবুও মানুষ তার কৃতকর্মের মধ্যেই অমর হয়ে থাকতে চায়। এ প্রসঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে লেখকের উক্তি :

> "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাকেই যুগ-যুগান্তর ধরে সেই অমরতার সূত্র ধরে রাখতে হয়েছে রক্ষা করতে হয়েছে যাতে দৃশ্য অথবা অদৃশ্যভাবে গ্রথিত রয়েছে সামান্য আর অসামান্য-নির্বিশেষে সেই মানুষের কীর্তি বা কাজগুলো, যাদের মালা করে গেঁথে বিকশিত হয়ে চলেছে মানুষের যত সৌন্দর্যের মূল্যবোধ।" [১৬]

---

১৪. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মানবিক মূল্যবোধে অমরতার নিরিখ) ; পৃ. ১৭

১৫. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : লেনিন গোর্কি গ্রামসি) ; পৃ. ১৬২

১৬. রণেশ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মানবিক মূল্যবোধে অমরতার নিরিখ) ; পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্য-চেতনা থেকেই মূল্যবোধের জন্ম। মূল্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে এ সৌন্দর্যকে লালন করেছেন ।

গিওর্গি লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বকে বিবেচনায় এনেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। লুকাচ হাঙ্গেরীর মার্কসবাদী-লেলিনবাদী বিপ্লবী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ এবং দার্শনিক। তিনি মার্কস-লেনিনের বিপ্লবী দর্শনের মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন সৌন্দর্যের নিগূঢ় তত্ত্বকে। বিপ্লবের অগাধ উপকরণ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একজন শ্রমজীবীর মতোই তিনি সৌন্দর্যের অফুরন্ত খনি রেখে গেছেন। রণেশ দাশগুপ্তের এ ধারণাই বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর 'গিওর্গি লুকাচ : মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের অফুরন্ত খনি' প্রবন্ধে। যেখানে তিনি বলেছেন :

> "সৌন্দর্যতত্ত্ব ও বাস্তবজীবন তাঁর কাছে মৌল উপকরণ থেকেছে বরাবরই। স্বদেশেই হোক অথবা নির্বাসনে হোক সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে কাজ করার জন্যে বিপ্লব তাঁকে যে অগাধ উপকরণ ও অভিজ্ঞতা ও সংযোগ জুগিয়েছে, লুকাচ তাদের অপচয় বা অপব্যবহার করেন নি। এ দিক দিয়ে লুকাচ দীর্ঘজীবী পিকাসোর মতো খাটিয়ে মানুষ। শ্রমজীবীরা যে শোষণমুক্ত বিশ্ব গড়বার জন্যে ব্যাপৃত, একজন শ্রমজীবীর মতোই সৌন্দর্যের দিকটাকে লুকাচ পরিস্ফুট করে গেছেন তাতে। --- রেখে ঢেকে মুখরক্ষা করে বক্তব্য বলা লুকাচের ধাতে ছিল না। নিজেকেও তিনি রেহাই দেননি। এমন কি ব্রেখটকেও নয়। বাস্তবজীবন থেকে সরে গেলে সত্য ও সুন্দর দুইই উঠে যেতে বাধ্য, এই চিন্তাকে নিজের উপরেই প্রয়োগ করেছেন তিনি।" [১৭]

লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মূলমর্ম হচ্ছে বুর্জোয়া অবক্ষয় ও একাকী মানুষের বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মানুষের সঙ্গে ছন্দিত ব্যক্তির মানবীয় গুণের উৎসারণ ও বৈপ্লবিক সক্রিয়তা এবং জনগণের স্বপ্নকে বিমূর্ত না রেখে তাকে বাস্তবে রূপ দেয়া। পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমজীবী মানুষ যাতে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদীকে উচ্ছেদ করে জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে পারে সে সাধনার মধ্যেই নিহিত ছিল লুকাচের সৌন্দর্যতত্ত্ব। সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ গিওর্গি লুকাচ সম্পর্কে সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন :

> "হাঙ্গেরির বিপ্লবী সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক গিওর্গি লুকাচ মার্কসীয়-লেনিনীয় সৌন্দর্যতত্ত্বকে হাজার বছরের জ্ঞান ও রূপের আলোকে সজ্জিত করেছিলেন। লুকাচের উপন্যাসের তত্ত্ব (১৯১৫), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৯৩৭), সমসাময়িক বাস্তবতার তাৎপর্য (১৯৫৭),

১৭. প্রাগুক্ত, আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (প্রবন্ধ : গিওর্গি লুকাচ : মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের অফুরন্ত খনি) ; পৃ. ১০২ ও ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষত্ব (১৯৬৩) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে লেখক এ প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যের সারসত্য তুলে ধরেছেন। এসব গ্রন্থে তাঁর মৌলিক বক্তব্য হচ্ছে, 'খণ্ড খণ্ড করে সৌন্দর্য বিচার নয়, সামগ্রিক গতিধারা ও মূল গতিমুখই বিচার্য হওয়া উচিত।" [১৮]

রণেশ দাশগুপ্তের নন্দনতত্ত্বের দিক বিবেচনা করে মফিদুল হক লিখেছেন :

"তত্ত্বগতভাবে তিনি ছিলেন রূপ-বিচারী, সৌন্দর্য-সন্ধানী। তাই তাঁর লেখায় নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা ছিল মুখ্য, তিনি সাহিত্যের পাঠ থেকে সুন্দরের উপাদানগুলো তুলে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, অসুন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন, তা কখনো বিবেচনায় আনেন নি। সে-কারণে প্রথাসিদ্ধ সমালোচকদের থেকে ভিন্নতর ছিল তাঁর সাহিত্য-আলোচনা, ক্রিটিক তিনি কখনো হননি, রূপের ব্যাখ্যাতা হিসেবেই সদা কাজ করে গেছেন। সাহিত্য-সমালোচনায় সাধারণভাবে যে বিবাদ বা বাদানুবাদ প্রত্যক্ষ করা যায় সেটা তাঁর লেখায় কখনো ঠাঁই পায়নি। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বিপ্লবী অন্ধত্ব থেকে রবীন্দ্রনাথকে বর্জনে উদ্যত হলো তখন সেই নীতি মেনে নিতে পারেননি রণেশ দাশগুপ্ত।" [১৯]

'মায়ের কোলে শিশু'-র চিত্রাত্মক সৌন্দর্যকে অবলোকন করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। মা ও শিশুর এ চিত্ররূপ তাঁর দৃষ্টিতে অনন্য :

"চাঁদ যেমন পুরনো হয় না, ধ্রুবতারা যেমন বাসি হয় না, তেমনি মায়ের কোলে শিশুর ছবি কখনও একঘেয়ে হয় না।" [২০]

এ ছবির কোন জাত নেই। যে কোন দেশের যে কোন শিল্পী এ দৃশ্যের চিত্রাঙ্কন করতে গেলে তা হবে একই জাতের, একই ধাঁচের। এ সৌন্দর্য সকল কালে সকল মানুষকে মুগ্ধ করবে।

'কমরেড পিকাসো : শিল্পী ও জীবনচরিত' প্রবন্ধে কমরেড পিকাসোর চিত্রশিল্পের সৌকুমার্যকে তুলে ধরেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। জগৎ-জীবনকে চোখ ভরে অবলোকন করেছেন পিকাসো :

"চোখভরে পিকাসো দেখেছিলেন জগৎকে, জগতের পটভূমিতে মানুষকে, মানুষের মুখচ্ছবি ও

---

১৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত (সৈয়দ আজিজুল হক রচিত প্রবন্ধ 'রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধসাহিত্য'); পৃ. ২৭২

১৯. প্রাগুক্ত (মফিদুল হক রচিত প্রবন্ধ 'রূপবিহারী ও রসসঞ্চারী, ত্যাগব্রতী ও জ্ঞানব্রতী রণেশ দাশগুপ্ত'); পৃ.১৪৮

২০. লিয়াকত উল্লাহ (সম্পাদক), বাংলা আমার বাংলা (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ : মায়ের কোলে শিশু), ১৯৭০, একুশের সংকলন, সপ্তর্ষি সংঘ, ৩২ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ; পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

> গঠনকে মানুষের দেহাবয়বকে ও কাঠামোকে। --- দেখেছিলেন মানবিক-প্রাকৃতিক-সামাজিক পরিবেশের স্থাবর জঙ্গমের আকর্ষিত-বিকর্ষিত রূপকে, মানুষের বাইরের আচরণকে, মানুষের অন্ত জীবনকে।" [২১]

তাঁর দেখাকে তিনি চিত্ররূপ দিয়েছেন কাঠ, পাথর আর রঙ তুলির ক্যানভাসে। শিল্পের নান্দনিক দিকটি রণেশ দাশগুপ্তের উক্ত প্রবন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

'কবিতা যেন জীবন্ময়ী নদী' প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত কবিতার আঙ্গিকরূপ বা কাঠামো নিয়ে ভাবেননি, তিনি এর ভাবগত দিকটি নিয়েই চিন্তা করেছেন। যেখানে তিনি কবিতাকে গতিশীল মানবজীবনের চেতনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে চেতনা প্রবহমান নদীর মতোই বহমান। জীবনরূপী নদীর মতো প্রবহমান এ কবিতা। এ কবিতা যেন,

> "মরুভূমির দেশেও পথ হারায় না। মজা নদীর দেশেও গতি হারায় না। প্রাচীন হলেও নিত্য নবীনা এই নদী। মাঝে মাঝে প্লাবন আসে। অজস্র কবিতা অগণিত ঢেউয়ের মতো বসন্তকালের রঙীন ফুলের মতো এই নদীকে ভরপুর করে তোলে।" [২২]

মানবজীবনে কবিতার প্রভাব ব্যাপকতর। এ কবিতা মানুষের জীবনকে ঘিরে আছে। মানুষের সংগ্রামী জীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গেও কবিতাকে অবিচ্ছেদ্য ভেবেছেন রণেশ দাশগুপ্ত :

> "ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধ যারা করলো, তারা ফ্রান্সের অপরাজেয় জনগণ। কবিতা তাই হলো অপরাজেয় বিপ্লবী।" [২৩]

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত বাংলা কবিতাও বাঙালি মনে প্রভাব ফেলেছে।

সমকালীন পারি-পার্শ্বিক পরিস্থিতির উপরও কবিতার ভাব ও ভাষা গঠিত হয়ে ওঠে। 'নতুন লেখার অপেক্ষায়' প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা যায়, সংগ্রাম যত বেশি ব্যাপক হয়েছে লেখকদের লেখার ভাষাও তত বেশি খুরধার হয়েছে। মাতৃভাষার শক্তিকে বোঝাতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

---

২১. আবুল হাসনাত (সম্পাদক), গণসাহিত্য (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'কমরেড পিকাসো : শিল্পী ও জীবনচরিত'), ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৭৩, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৮

২২. প্রাগুক্ত, গণসাহিত্য (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'কবিতা যেন জীবন্ময়ী নদী), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৯ ; পৃ. ১৩

২৩. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

"দেশে দেশে যুগে যুগে মাতৃভাষা আর মানুষের মুক্তির সংগ্রাম যেখানে এক হয়েছে, সেখানে নতুন লেখা বেরিয়ে এসেছে কখনও নির্ঝরের মতো, কখনও নদীর জোয়ারের মতো। আন্দোলন শক্তি দিয়েছে মাতৃভাষাকে। মাতৃভাষা শক্তি দিয়েছে আন্দোলনকে। বদলে গিয়েছে আন্দোলনের ধারা।" [২৪]

এমনিভাবে সমকালীন রাজনৈতিক আবহে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধশালী। মাতৃভাষার শক্তি অসীম। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত বলেছেন ;

'মাতৃভাষাকে ব্যাপৃত হতে হয়েছে নতুনতর রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বিপ্লব বা পরিবর্তন সাধনে।' [২৫]

জনতা মাতৃভাষার মাধ্যমে হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনে মাতৃভাষার গুরুত্বকে অনুধাবন করেছেন প্রবন্ধকার।

শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই রণেশ দাশগুপ্ত গণমানুষের সম্পৃক্ততাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'শিল্প-সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে জনগণের গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। জনগণ ছাড়া সাহিত্য-শিল্প অচল। 'অদৃশ্য জনতা' প্রবন্ধেও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অদৃশ্য জনতার প্রভাবকে স্বীকার করা হয়েছে। লেখক ও শিল্পীর কাহিনী ও ছবিতে অদৃশ্য জনগণও দৃশ্যমান হয়ে ফুটে ওঠে।

'আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ' এবং 'ছবি, গণদর্শক, মেহনত' প্রবন্ধেও চিত্রকলার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে স্বীকার করা হয়েছে। 'সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণের মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নে' প্রবন্ধেও শিল্পী ও জনগণের পরস্পরের সহায়ক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। 'চলচ্চিত্রের জনতা প্রবণতা' এবং 'চলচ্চিত্রের দিক রূপ ও কর্ম নির্ণয়ে চলচ্চিত্র সংঘ' প্রবন্ধেও চলচ্চিত্রের সঙ্গে জনতার প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে দেখা যায়, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, চিত্রকলা তথা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই রণেশ দাশগুপ্ত জনগণের ভূমিকাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। শিল্পকলা সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্তের নিজস্ব চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মতে :

"বিশ্ব প্রকৃতির যে নানা উপাদান মানুষের কামনা বাসনার স্বাক্ষর বহন করে জীবনের ভঙ্গিমাকে

---

২৪. বিজন ভট্টাচার্য ও অমরজিত মিত্র (সম্পাদক), আহুতি (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'নতুন লেখার অপেক্ষায়'), ১৯৭২, একুশের সংকলন, আবাহন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ; পৃ. ৬

২৫. হাসান ফেরদৌস (সম্পাদক), ভালবাসার বাগান থেকে (রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'মাতৃভাষা কতিপয় বিবেচনা'), মেঘদূত সংঘ ; পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

> ব্যঞ্জনা দেয় তারাই তো শিল্পকলার উপাদান। অবশ্য এদের উৎস হচ্ছে অর্থনৈতিক সমাজ ও জীবিকা। মনন রয়েছে এদের সঙ্গে জড়িয়ে। শিল্পকলা তাই মননকে বাদ দিতে পারে নি একেবারে। --- শিল্পকলার মূলে রয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি, সমাজ, চেতনা। কিন্তু প্রকাশ আবেগে স্পৃহায়। রঙ্গে সুরে রেখায় যাকে পাই এলায়িত।" [২৬]

আবেগ অনুভূতি ও প্রবৃত্তির নিদর্শন রেখে যায় মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির উপর। মানুষের এ কামনা-বাসনা ও আবেগ অনুভূতি থেকেই শিল্পকলা জন্ম দেয়।

সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা :

> "সংস্কৃতি বলতে আজ আমরা মানসিক অনুভূতিপ্রধান এক বিশেষ ধারার নানা উপাদানকে বুঝি। এই ধারায় পাওয়া যাবে, রুচিরীতি সাজসজ্জা খেলা পুঁথিপত্র অলঙ্কার প্রসাধন বিলাস শিল্পকলা প্রভৃতি।" [২৭]

মানুষের জীবন-যাত্রার প্রণালীই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। জীবনে চলার পথে মানুষের অর্জিত আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সমন্বয়েই গঠিত হয় আমাদের সংস্কৃতি।

রণেশ দাশগুপ্ত শিল্পীর স্বাধীনতা ও আবেগকে সবসময় প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রতিটি শিল্পীই নিজস্ব আবেগ-প্রবণতা থেকে চিত্রাঙ্কনের প্রতি আকর্ষিত হয়। এ আবেগ প্রবণতাই তাঁকে সীমাহীন ভাবনার রাজ্যে বিচরণ করায়, সৃষ্টি করায় নতুন নতুন শিল্পকর্ম। শিল্পী এখানে সকল বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন। স্বাধীনতার সৌন্দর্যচেতনাকেও রণেশ দাশগুপ্ত মূল্যায়ন করেছেন তাঁর 'আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত' প্রবন্ধে।

রণেশ দাশগুপ্ত রচিত বিচিত্র প্রবন্ধাবলির মধ্যে উপন্যাসবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি। তিনি দেশী-বিদেশী বহু ঔপন্যাসিকের বিখ্যাত উপন্যাস নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর পর্যালোচনার মধ্যে মার্কসীয় চেতনার বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে উপন্যাসের তত্ত্বালোচনা এবং গতি প্রকৃতিও উপেক্ষিত হয়নি। তাঁর 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' গ্রন্থটি উপন্যাসের তত্ত্বালোচনা সম্বলিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি দেশী-বিদেশী মার্কসবাদী উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের তত্ত্ব ও প্রবণতা আলোচনার পাশা-পাশি উপন্যাসের আঙ্গিকগত ও রূপগত পরিচর্যা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামালের অভিমত :

---

২৬. রণেশ দাশগুপ্ত, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (প্রবন্ধ : সাহিত্য), প্রাগুক্ত ; পৃ. ১০
২৭. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

"সতের-আঠার শতকের ইউরোপে বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার, প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ, শিল্পবিপ্লবের পটে সামাজিক শ্রেণীসমূহের অভ্যন্তর দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং কতিপয় দেশে মাতৃভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের পরিস্থিতি থেকে তৈরী হয়েছিল উপন্যাস-জন্মের যোগ্য প্রতিবেশ। --- বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বিশ্ব উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা দেয় শিল্পরূপগত সংকট, গুণাত্মক পরিবর্তন ও নতুনত্বের অভিঘাতে আন্দোলিত হয় এর দেহ আত্মা। রণেশ দাশগুপ্ত এই দিক পরিবর্তনকে কেন্দ্রবিন্দু করে রচনা করেন দেশজ-বৈশ্বিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সংবলিত শিল্পরূপ বিবেচনাধর্মী গ্রন্থ 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯)। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক উপন্যাস ধারার অন্তর্দর্শী পর্যালোচনা। বিশেষ তত্ত্বাদর্শ, মনস্বিতা ও নতুন জিজ্ঞাসার বৈপ্লবিক প্রান্ত উন্মোচনে রচনাটি বিস্ময়কর।" [২৮]

সময়ের ক্রমিক বিবর্তনের ধারায়, জীবনের তাগিদে যখন যে চেতনার জন্ম হয় তাকেই উপন্যাসের শিল্পরূপে সার্থক করে তোলার প্রচেষ্টা করেন সৃজনশীল শিল্পীরা। লেখক ও পাঠকের প্রয়োজনের তাগিদে উপন্যাসে বিষয়গত, ভাবগত ও রূপগত বৈচিত্র্য আসে এবং গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়।

রণেশ দাশগুপ্ত উপন্যাসের শিল্পরূপের পরিবর্তনের তিনটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করেছেন। ১. একজন সৃজনশীল শিল্পী প্রচলিতের পুনরাবৃত্তি করতে পারে না, ২. পাঠক-পাঠিকার রুচি অনুযায়ী শিল্পরূপ বদলায়, ৩. নতুন বিষয়বস্তু চায় নতুন প্রকাশভঙ্গি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতাব্দীতে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে উপরিউক্ত তিনটি কারণই সক্রিয় ছিল। জীবনের প্রবাহের অবিশ্রান্ত প্রবাহের সঙ্গে গভীরতম সংযোগ রেখে একটা সঠিক সমতায় পৌঁছাবার দায়িত্ব বর্তেছে জীবনশিল্পীদের উপর। এমন একটি ধারণা পোষণ করেন রণেশ দাশগুপ্ত।

রণেশ দাশগুপ্তের দৃষ্টিতে 'উপন্যাস যে হাসিখেলা নয়, এটা যে সত্যের অস্ত্র, এটা যে জীবনের বিপ্লবী দর্শন।' [২৯] যে উপন্যাস মানবজীবনের যত বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছে তা তত বেশি শিল্পসাফল্য লাভ করেছে। এ উপলব্ধিটুকু রণেশ দাশগুপ্তের মধ্যেও ছিল। তিনি উপন্যাসের শিল্পরূপ বিচারের ক্ষেত্রে বাস্তবতা, কল্পনাপ্রবণতা ও লোকজশব্দ ব্যবহার এ তিনটি উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি দেশী-বিদেশী বহু উপন্যাস থেকে এ তিনটি উপাদানের সার্থক প্রয়োগ আবিষ্কার করেছেন।

---

২৮. বেগম আকতার কামাল, বিশ্বযুদ্ধ, জীবন ও কথাশিল্প (প্রবন্ধ : রণেশ দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' পাঠসমীক্ষা), ২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ; পৃ. ১৬২ ও ১৬৩

২৯. রণেশ দাশগুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ (ভূমিকা), ১৯৫৯ (পরিবর্ধিত সং ১৯৭৩), পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

> "ডিফোর ক্ষেত্রে দেখা গেল, তিনি সবসময়ে পাঠক-পাঠিকার কানে কানে বলছেন, 'সত্য ঘটনা --- আমি নিশ্চয় করে বলছি তোমাকে।' সকলেই চায় অবিকল প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকা চায়, গ্রন্থ তাদের টেনে নিক নিজের মধ্যে এবং এ ব্যাপারটা সম্পন্ন হোক অলক্ষ্যভাবে।"[৩০]

উপন্যাস যে বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন রণেশ দাশগুপ্ত ডিফোর উপন্যাস থেকে সে দিকটিই তুলে ধরেছেন। এমনিভাবে ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স, ফিল্ডিং, সুইফ্‌ট, পুশকিনসহ বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু ঔপন্যাসিকের উপন্যাস থেকে উপরিউক্ত তিনটি উপাদানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন রণেশ দাশগুপ্ত।

উপন্যাসের শিল্পরূপ বিচারে রণেশ দাশগুপ্ত মানব চরিত্রের দ্বৈত-সত্তা বাস্তববাদ ও ভাববাদের উপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গ্যেটের 'ভের্থেরের দুঃখ', র‍্যালফ ফক্সের 'উপন্যাস ও জনসাধারণ', ক্রিস্টোফার কডওয়েলের 'মায়া ও বাস্তব', গোর্কির 'মা', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'শেষের কবিতা'. প্রভৃতি গ্রন্থের আলোকে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর বাস্তবতা ও কল্পনাপ্রবণতার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভাব প্রধান

> "উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাকে হাতে ধরে মায়া জগতে নিয়ে যায়, সেখানে চরিত্রাবলি এসে দাঁড়ায় পরমাত্মীয়ের মতো। গ্রন্থের মলাট খোলা যেন স্বপ্নপুরীর দরজা খোলা। --- বাস্তববাদী উপন্যাস যেমন বহির্বাস্তবের বা পরিবেশের বা জাগতিক ব্যাপারের আধিক্য এবং আত্মিক ঋজুতার মিশ্রণ, অপর দিকের ধারায় ভাবলৌকিক উপন্যাস তেমনি আত্মিকতার আতিশয্য এবং বাস্তবের খন্ডিত অস্তিত্বের মিশ্রণ। অতি আত্মিক বা অতি কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক উপন্যাসের পরিণতি সাংসারিক বাস্তব হিসেবে ট্র্যাজেডি বা ব্যর্থতা।" [৩১]

প্রকৃতপক্ষে এ আত্মিকতার দরুণ বাস্তববাদী উপন্যাসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে বলে রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন। অতি রোমান্টিক ভাবাকুলতা চরিত্রকে বাস্তবাতীত করে তুলে। তবে শ্রেষ্ঠ, প্রতিভাবান লেখকদের হাতে রোমান্টিকতা যদি ইতিবাচক মাত্রা পায় সে ক্ষেত্রে চরিত্র হয়ে ওঠে বীর্যবান, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র অমিত পুরোপুরি রোমান্টিক চরিত্র হয়েও ব্যক্তিময়তা সুগঠিত। এ ক্ষেত্রে চরিত্রের ব্যক্তিময়তা বা রোমান্টিকতা উপন্যাসে সংকট সৃষ্টি করে না বলে রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন।

---

৩০. প্রাগুক্ত ; পৃ. ১২

৩১. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মানব চরিত্রের দ্বৈত সত্তা) ; পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস শিল্পের মনোবাস্তববাদী ধারার ভবিষ্যত নিয়েও রণেশ দাশগুপ্ত ভেবেছেন। উনিশ শতকের উপন্যাস-চরিত্রে-ছিল গতিহীনতা। আর এ গতিহীন, নিশ্চল চরিত্রে বহুমাত্রিক চেতনা প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে বিশ শতকের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ছোঁয়ায়। এখানে চরিত্র হয়ে উঠেছে গতিশীল, দ্বান্দ্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী। তবে এ আত্মিক চেতনা প্রবাহ উপন্যাসে সৃষ্টি করেছে বিয়োগাত্মক জটিলতা।

মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকরা মানবমনের ভেতরকার মানুষটিকে, জৈব মানবের শোণিত প্রবাহ, আদিম বৃত্তিপুঞ্জকে আবিষ্কার করেছেন তাঁদের উপন্যাসে। এ জাতীয় উপন্যাস-চরিত্রে চারিত্রিক দৃঢ়তা রক্ষিত হয় নি।

এ উপন্যাসের তত্ত্ব-চিন্তাও এর প্রভাবে আক্রান্ত হয়েছে অনিশ্চয়তায়। মানবমনের অবচেতন মন বেরিয়ে এসেছে, চেতনমনের আবরণ ছিঁড়ে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> "ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে যে আদিম অতীন্দ্রিয়বাদের রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রিত রয়েছে, তা ডি, এইচ, লরেন্সে প্রকাশ্য ও প্রগাঢ়তর। ফ্রয়েডের তত্ত্বে গ্রামাণ্যের গাঁথুনি আছে-ডি. এইচ. লরেন্সে তা অনুপস্থিত। কিন্তু এ এলোমেলো ভাবের মধ্য দিয়েই লরেন্স ফ্রয়েডীয় মতবাদের মধ্যকার অবৈজ্ঞানিক রহস্যময়তার হাড়ি হাটের মধ্যে ভেঙ্গে দিয়েছেন।" [৩২]

মূলত ফ্রয়েডীয় চেতনা মনস্তাত্ত্বিকতার ধারা থেকে একটি বিশেষ প্রবণতার জন্ম দিয়েছে যা নর-নারীকে তাদের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ও আবেগ-ক্রিয়ার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অবচেতনের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে। উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণের একমাত্রিক প্রয়োগ উপন্যাস ও তার চরিত্রকে সংকীর্ণ করে। উপন্যাসের এ নেতিবাচক প্রবণতা দূর করে কীভাবে ইতিবাচক বিকাশকে সম্ভাবনাময় করে তোলা যায় সে ভাবনা রণেশ দাশগুপ্তের ছিল।

রণেশ দাশগুপ্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় অভ্যুদয়মূলক উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি নিয়েও ভেবেছেন। লোকগদ্যের অভাবে মাতৃভাষায় মানসম্পন্ন উপন্যাস এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কোন কোন দেশে স্বাধীনতা অর্জনের পরও রচিত হয়নি। লেখক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে লোকগদ্যের গুরুত্বের কথা ভেবে বলেছেন :

> "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সব দেশের জনসাধারণের মাতৃভাষার আত্মপ্রকাশের গবাক্ষপথগুলোকেও রুদ্ধ করে রেখেছিল মোড়লী, কায়েমী, স্বার্থবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা।" [৩৩]

---

৩২. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : মনস্তত্ত্বের বিয়োগাত্মক ধারা) ; পৃ. ৫৩ ও ৫৪

৩৩. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকা) ; পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী শাসকদের ভাষাতে লিখতে বাধ্য হয়েছেন এ সব দেশের লেখকরা। লোকগদ্য তথা মাতৃভাষা উপন্যাসের অন্যতম মৌলিক উপাদান সত্ত্বেও জনগণের অভ্যুদয়ের পটভূমিতে লিখিত উপন্যাসগুলোর ভাষা ফরাসি ও ইংরেজি। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ-দেশান্তরে শতাব্দীকাল ধরে মহাকাব্যিক ধারাতে উপন্যাস রচিত হলেও এতে মনস্তাত্ত্বিক বৈপ্লবিক দিকগুলো উনিশ শতকীয় বাস্তববাদী ধারাতে সীমাবদ্ধ ছিল ; গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির কর্মসূচী অধিকাংশ দেশেই বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

রণেশ দাশগুপ্তের দৃষ্টিতে বহুবিধ উপাদানে চীনা উপন্যাস সমৃদ্ধশালী। এ উপন্যাসে সন্ধান মিলবে, উপন্যাসের উদ্ভব, ইতিবৃত্তের ছক, লোকগদ্য ও বিকাশপর্ব। মধ্যযুগীয় কাহিনীর স্বপ্নকল্পনা ও অতিপ্রাকৃত থেকে চীনা উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছে এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত বিকাশের দিকে ধাবিত হয়েছে। মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে রচিত হয়েছে গদ্যমহাকাব্যমালা। উনিশ-বিশ

শতকের জাতীয় অভ্যুদয়মূলক মুক্তি-সংগ্রাম, সমাজবিপ্লব, বিপর্যয় ও নর-নারীর আত্মকথা সমন্বিত যুদ্ধমন্থিত জীবনের বৈচিত্র্যময়তা মহাকাব্যিক চেতনাকে স্পর্শ করেছে। চীনের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তথা রাজনীতি ও মনস্তত্ত্বের বিমিশ্রণে চীনা উপন্যাস হয়ে ওঠেছে ঐশ্বর্যশালী। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> "আসলে চীনা উপন্যাস জন্মেছে এমন এক সময়ে যখন জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বা জাতীয় অভ্যুদয় বুর্জোয়া বা ধনবাদী প্রভাবিত জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় নিবদ্ধ থাকেনি এবং এই কারণেই বুর্জোয়া বা ধনবাদী অবক্ষয় তাকে জন্মলগ্নেই ছেঁকে ধরতে পারেনি।" [৩৪]

আর এ কারণেই নতুন প্রাণের ছাড়পত্র পাওয়া সমাজব্যবস্থার সজীবতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে চীনের শিল্পীরা দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছে নতুন দেশ ও সমাজ গঠনের সম্ভাবনাময় দিগন্তের পানে।

বাংলাদেশের উপন্যাস-ধারায় রণেশ দাশগুপ্ত মানবমুক্তি, জীবনতৃষ্ণা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিপ্লব ও গণসংগ্রামের চেতনাকে আদর্শ-স্থানীয় কতগুলো উপন্যাসের আলোকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসের শিল্পরূপ বিচারের মূল উপাদান বাস্তব পরিবেশ,

---

৩৪. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : চীনা উপন্যাস) ; পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষা ও সজীব মানব-মানবী। এ জন্যেই বাংলা উপন্যাসে প্রথম থেকেই দেশজ উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', জহিরুল ইসলামের 'অগ্নিসাক্ষী' প্রভৃতি উপন্যাস বিবেচনা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' জাতীয়-অভ্যুদয় ধারার প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে ধর্মীয় প্রতীক ও ব্যক্তিমাহাত্ম্যের প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসের এ চেতনা পরবর্তীকালে 'গোরা' 'পথের দাবী' 'গণদেবতা' ও 'দর্পণ'-এ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'সংশপ্তক' 'আরেক ফালগুন' ও 'অগ্নিস্বাক্ষী' উপন্যাসে সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে চিরায়তিক জীবন-চিত্র বিধৃত হয়েছে। বাস্তবতার বিস্তার, লোকভাষার সারল্য বাংলা উপন্যাসকে করেছে সমৃদ্ধ। গ্রামবাংলার পারিবারিক জীবন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মুক্তিসংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব প্রভৃতি বিষয় বাংলা উপন্যাসে বর্তমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। '৫২ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবীতে বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ পাকিস্তানী শাসনের শৃঙ্খল ভাঙার সংগ্রামে মেতে উঠেছিল। বাংলা উপন্যাসের গণবৈপ্লবিক গতিধারা তথা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামী চেতনাকে স্মরণ করেই রণেশ দাশগুপ্ত বাংলাদেশের উপন্যাসকে মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

উপন্যাসের রূপতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব এ দুটো ধারা অবলম্বনে রণেশ দাশগুপ্ত দেশী-বিদেশী বহু উপন্যাসের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন তাঁর 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯) গ্রন্থে। এ ক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও বিজ্ঞ সমালোচকদের তত্ত্ব, তথ্য ও অভিমতকে আলোচনায় এনেছেন। একজন উৎকৃষ্ট সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি উপন্যাস-শিল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। উপন্যাসের সংকট নির্ণয় ও সংকট মোচনের নির্দেশনা রয়েছে এ গ্রন্থে। আন্তর্জাতিক উপন্যাস বিচারে তাঁর অনুসন্ধানী মন সদা জাগ্রত ছিল।

'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯) গ্রন্থের বাইরেও উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' গ্রন্থভুক্ত 'বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস' প্রবন্ধে উপন্যাস যে, শুধুমাত্র আকাশ-কুসুম ভাবনা বা যৌনদ্বন্দ্বের রসসমৃদ্ধ উপাখ্যান নয় বরং উপন্যাসে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ-বিপ্লবের ভাবাদর্শ ও জনচেতনাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত এ কথাই বলতে চেয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেখক বলেন :

> "এখন উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তার করেছে জনসাধারণ। বর্তমানে ইতিহাসে বুর্জোয়ার নায়কতার অবসান হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হতে চলেছে। এখন ইতিহাসের মূল নায়ক হয়েছে মেহনতী জনসাধারণ। মেহনতী জনসাধারণের লোকই হবে এখন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা।" [৩৫]

অর্থাৎ রণেশ দাশগুপ্ত মেহনতি মানুষকে উপন্যাসের মাঝখানে স্থান দিতে বলেছেন।

উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে লেখক তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হওয়া উচিত বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁর 'উপন্যাসের শিল্পকলাগত মূলসূত্র' প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে :

> "গত তিনশত বছরে যে সব অন্তর্দ্বান্দ্বিক বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাদের কারণ তলিয়ে দেখে উপন্যাসের শিল্পকলায় নতুন গুণ সঞ্চারিত করে তার ধারাকে অপ্রতিহত করে তোলার কথাটাও চিন্তার মধ্যে রাখা দরকার। বিশ শতকে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে চলেছে, সেটাও বাস্তবের গুণগত পরিবর্তন। শিল্পকলাতে তথা উপন্যাসে এই গুণগত বিপ্লবের বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি ঘটবে। ঘটেছে ইতিমধ্যে।" [৩৬]

উপন্যাস গতিশীল সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসও তার রূপ বদল করে। রণেশ দাশগুপ্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্যে সমাজ-রূপান্তরের বিষয়টি নিয়ে বেশি ভেবেছেন। উপন্যাস এমন একটি শিল্পমাধ্যম যার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে নবতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করতে পারে ; প্রেরণাও দিতে পারে। তাই ঔপন্যাসিককে অবশ্যই আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন হতে হবে। রণেশ দাশগুপ্তের আলোচনায় তাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সে-ই সব ঔপন্যাসিক যাঁরা সমাজসচেতন ও মানবকল্যাণকারী।

---

৩৫. রণেশ দাশগুপ্ত, আলো দিয়ে আলো জ্বালা (প্রবন্ধ : বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস) প্রাগুক্ত ; পৃ. ৫২ ও ৫৩

৩৬. প্রাগুক্ত (প্রবন্ধ : উপন্যাসের শিল্পকলাগত মূলসূত্র) ; পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

রণেশ দাশগুপ্তের শিল্প-চিন্তায় শিল্পের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানুষ। তাঁর শিল্প চিন্তার বিষয়টি নিয়ে ড. সৌমিত্র শেখর লিখেছেন :

> "অর্জিত শিক্ষা ও অধিগত বোধ-নির্মিতির স্বপ্নমহলে মানুষের ভাবনা নিশ্চিতভাবে সদাসঞ্চরণশীল। তার শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্প-বিবেচনা কোনভাবেই এ-থেকে বাইরে বেরুতে পারে না। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে যেহেতু পরিবর্তমান মানুষের শিক্ষা এবং অবশ্যই বোধ– সেহেতু এই ভাবনায় এর প্রতিচ্ছায়া অনিবার্য। রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন মূলত কার্ল মার্কসের চিন্তাশ্রয়ী দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দর্শনের অনুসারী। তাঁর জীবনযাপন ও মূল্যায়ন-দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আদর্শের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর। সাহিত্য-বিবেচনাতেও তাঁর ভাবনা মার্কসীয় গণ্ডি অতিক্রম করে নি। তবে তিনি সংবেদনশীল মন নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের পরিমণ্ডল, সংকট ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। মার্কসপন্থী সমালোচকগণ যেখানে প্রায়শ শিল্প-সাহিত্যের বহিরঙ্গ আলোচনায় আগ্রহী এবং মেহনতের সঙ্গে এর যোগসূত্র কতটুকু সুদৃঢ় তা আবিষ্কারে অগ্রবর্তী ; রণেশ দাশগুপ্ত সেখানে তত্ত্বের আপাত পরিবেষ্টন ছিন্ন করে এর রূপচিন্তা ও নন্দন-বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগী। এ-কারণে বাস্তবের হুবহু অনুকৃতিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয় তাঁর বিবেচনায়। মূলত মানব-জীবনের সংকটমুক্তি, বিশেষত মেহনতি মানুষের আত্মমুক্তি তাঁর প্রার্থিত বটে, কিন্তু তা কোনভাবেই শিল্প-সাহিত্যের প্রাণবায়ু রুদ্ধ করে নয়।" [৩৭]

ফলে মার্কসপন্থী ও কথিত মানবতাবাদী উভয় শ্রেণির সাহিত্য-সমালোচকদের চেয়ে রণেশ দাশগুপ্ত পৃথক একথা বলা চলে নিশ্চিতভাবেই। রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, মানুষের জন্মের মধ্যেই আছে বিরাট সম্ভাবনা এবং সকল শিল্পের আধার এখানেই সংগুপ্ত। তাই মানুষের সম্ভাবনাই তাঁর শিল্পচিন্তা কেন্দ্রে অবস্থিত। মানুষের মধ্যেই সব সৌন্দর্য অন্বেষণ তাঁর। অর্থাৎ মানুষ আর সৌন্দর্য– কোনটি ছেড়ে কোনটি নয়। বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধের মননশীল ধারায় এ দুয়ের চমৎকার সংযোজন রণেশ দাশগুপ্তকে অন্যান্য প্রাবন্ধিক থেকে করেছে পৃথক, অনন্য।

---

৩৭. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত (ড. সৌমিত্র শেখর রচিত প্রবন্ধ 'রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-ভাবনা') ; পৃ. ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় রণেশ দাশগুপ্ত আপন কর্ম ও স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তি। তাঁর জীবন, সমকাল ও মানস অনুসন্ধান করে এ কথাই বলা চলে যে, বিক্ষুব্ধ সমকালে বিচিত্র জীবনজিজ্ঞাসা সাঙ্গীকরণের মাধ্যমে তাঁর ঋদ্ধ মানসক্ষেত্র গড়ে উঠে। জীবনের উপভোগ্য উপকরণসমূহ সহজে ত্যাগ করে, আসামের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হওয়া এই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব পরিশেষে বাংলাদেশের মেদিনী আর এ অঞ্চলের মানুষকেই যে আপন করে নিলেন, তাঁর দেহভস্ম যে মিলিয়ে গেলো এ দেশেরই মৃদুমন্দ সমীরণে, তার কারণ বাঙালি আর স্বীয় পূর্ব-পুরুষের বাসস্থানের প্রতি রণেশ দাশগুপ্তের সহজাত ও অমিত আকর্ষণের সীমায় আবদ্ধ। বৈরী সমকালে রাষ্ট্রীয় পীড়ন সত্ত্বেও তিনি দেশত্যাগী হন নি, শুধু এ অঞ্চলের মাটি আর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য। এই দায়বদ্ধতাই রণেশ দাশগুপ্তের সমস্ত কর্মের মূলে; সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব কর্ম।

পূর্বে আলোচিত অধ্যায়সমূহে দেখা গেছে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষায় গবেষণামূলক প্রবন্ধরচনার একটি ধারা রচিত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণকারী সীমিত কয়েকজন লেখকের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত অত্যন্ত সফল ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে বলা যায়, এগুলো প্রচলিত অর্থে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতি অনুসারে হয়তো রচিত নয়, কিন্তু এখানে যে অন্বেষণ এবং এর ফলে গৃহীত যে সিদ্ধান্ত তা বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধে অনন্য অর্জন হিসেবে স্বীকৃত। বিদেশী সাহিত্য আলোচনার একটি ধারার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। সৃজনশীল সাহিত্য আলোচনায় দেশী ও বিদেশী সাহিত্য কিভাবে ও কোন প্রক্রিয়ায় অনিবার্য মিথস্ক্রিয়ায় লীন হতে পারে, রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে সে অনন্য পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধে বিদেশী বা দেশী সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতির বাহুল্য নেই। উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছেন অতি সংক্ষেপে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি ব্যবহার না করে, বক্তব্যকে লিখেছেন নিজের সংহত ভাষায়। ফলে রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধসমূহ স্বল্পাবয়ব, মেদহীন। তাঁর ভাষা দ্যুতিময়, শান দেয়া তলোয়ারের মতো। গ্রন্থের নামকরণেও সেই প্রভা ও বৈভবের পরিচয় আছে।

Dhaka University Institutional Repository

'উপন্যাসের শিল্পরূপ' গ্রন্থটি ছাড়া তাঁর অন্য গ্রন্থাবলি আসলে স্বল্পাবয়ব প্রবন্ধের মূল্যবান পসরা। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে প্রকাশিত সাহিত্য ও শিল্প-চিন্তা সমকালীন অন্য রাজনীতিক বা সাহিত্যিকদের তুলনায় স্বতন্ত্র। কারণ তিনি শুধু প্রচলিত মতাদর্শকে গুরুত্ব দেন নি, মতাদর্শের সঙ্গে মনুষ্যত্ব ও সৌন্দর্যের সম্মিলন কামনা করেছেন। আবার বলা যায়, তাঁর সাহিত্য ও শিল্প-চিন্তার আদর্শবোধটাই এমন, প্রচলিত মতাদর্শ, মনুষ্যত্ব, সৌন্দর্য এই তিনের মেলবন্ধনে যা গড়ে উঠেছে। পূর্বের অধ্যায়সমূহে যে পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, তার নিরিখে একথা বলা বলে যে, প্রবন্ধ রচনায় রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে পৃথক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ভাবনা অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় রণেশ দাশগুপ্ত নিজস্ব বোধ, প্রকাশ ও অভিজ্ঞতার আলোকে দ্যুতিময়, স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ঘণ্ট

আকর গ্রন্থাবলি

১. উপন্যাসের শিল্পরূপ, ১৯৫৯, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭৩
কালিকলম প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

২. শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, ১৯৬৬
মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩. আলো দিয়ে আলো জ্বালা, ১৯৭০
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১২ মণিহারি পট্টি, ঢাকা।

৪. আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, ১৯৮৬
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৫. মুক্তিধারা, ১৯৮৯
জ্ঞান প্রকাশনী, ১৫ লারমিনি স্ট্রিট, ঢাকা-১২০৩।

৬. সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা, ১৯৯৪
উথক প্রকাশনী, ৪০ ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় / প্রবন্ধ আলোচনায় এসেছে :

উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯)

প্রবন্ধাবলি

১। তিনটি উপাদান

২। মানব চরিত্রের দ্বৈত সত্তা

৩। মনস্তত্ত্বের বিয়োগাত্মক ধারা

৪। নেতিবাচক ও ইতিবাচক পাশাপাশি

৫। আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকা

৬। চীনা উপন্যাস

৭। বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা (১)

শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (১৯৬৬)

প্রবন্ধাবলি

১। সাহিত্য

২। শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে

৩। আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ

৪। আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলো দিয়ে আলো জ্বালা (১৯৭০)

প্রবন্ধাবলি

১। সোনার হরিণ

২। শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা

৩। মানবিক মূল্যবোধে অমরতার নিরিখ

৪। অদৃশ্য জনতা

৫। শিল্প সাহিত্যে জনগণের ভূমিকা

৬। সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণের মধ্যে দূরত্বের প্রশ্নে

৭। মেহনতের শক্তি ও প্রত্যয়

৮। সময় হয়েছে নিকট এবার

৯। বিপ্লবী গণশিল্পবোধের আলোকে উপন্যাস

১০। উপন্যাসের শিল্পকলাগত মূলসূত্র

১১। কবিতা ভাষা মাতৃভাষা

১২। অব্যাহত কবিতার জন্য

১৩। আলো দিয়ে আলো জ্বালা

১৪। ছবি ও কবিতার শাসন প্রশ্রয়

১৫। নজরুল-কাব্য প্রবাহের জঙ্গম বিচার

১৬। গিরিফুল

১৭। নতুন স্মৃতিতে আরোহণ

১৮। সুকান্ত-নিকষিত হেম

১৯। ছবি, গণদর্শক, মেহনত

২০। ফুল আর ফুল, পাখি আর পাখি

২১। চলচ্চিত্রের জনতা প্রবণতা

২২। চলচ্চিত্রের দিক, রূপ ও কর্ম নির্ণয়ে চলচ্চিত্র সংঘ

Dhaka University Institutional Repository

২৩। নামকরা উপন্যাসের নামকরা ছবি

২৪। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লেনিন

২৫। লেনিন, গোর্কি, গ্রামচি

২৬। আইরিশ বাংলা, সীয়ান ওক্যাসি

২৭। শেখ সাদী যাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারতেন

আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬)

প্রবন্ধাবলি

১। আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ

২। মার্কসীয় বাতাবরণ : শতাব্দীকালের সাহিত্যে

৩। দস্তয়েভস্কি : দিনবদলের পালায়

৪। প্রবীণ ও নবীন দুই মহাবিদ্রোহী সহযোগী

৫। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ধ্রুপদী কবি মায়াকভস্কী

৬। এলেক্সী টলস্টয় ও তাঁর 'অগ্নি পরীক্ষা'

৭। পাবলো নেরুদা : অবিরত কাব্যকৃতি

৮। গিওর্গী লুকাচ : মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের অফুরন্ত খনি

৯। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

১০। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ পরিক্রমা : খাদে নিখাদে

১১। শরৎ জিজ্ঞাসার সূত্র

১২। অব্যাহত অবিভাজ্য অপরিহার্য প্রতিনিয়ত নজরুল

১৩। মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ

১৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫। বিপ্লবী নয়া ধ্রুপদী গণ-কথাশিল্পী সত্যেন সেন

১৬। সোমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি

১৭। মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা

১৮। শহীদুল্লা কায়সার-কত বিদ্রোহ অগ্নিশিখা

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিধারা (১৯৮৯)

প্রবন্ধাবলি

১। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি

২। শ্রেণীদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চিত্তভূমি

৩। দুই পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ

৪। স্বাধীনতা দিবসে হিসাবের খাতায় জমা বিপ্লব

৫। ২৪ শে এপ্রিলের শহীদদের স্মরণে

৬। বলি বলি করে, বলিতে না পারি

৭। নৈরাশ্যবাদী একাকীত্ব সম্পর্কে

৮। সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রশ্নে

৯। মার্কসবাদ কি অপ্রস্তুত ?

সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা (১৯৯৪)

প্রবন্ধাবলি

১। বিদ্যাসাগর : আধুনিক বিদ্রোহী রূপরঙ্গী

২। স্বামী বিবেকানন্দ : সহযাত্রী সাম্যবাদী

৩। রবীন্দ্রনাথ : যৌবনের কাছে প্রার্থী

৪। লালন : শাশ্বত ও বৈপ্লবিক

৫। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন জন্মশত বার্ষিকীতে

৬। ভল্গা থেকে গঙ্গা : মহালগ্নের মহাগ্রন্থ

৭। সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা

৮। এ মশাল 'নেভে নেভে নেভে না'

৯। 'অপরাজিত' উপন্যাসে কমিউনিস্ট চরিত্র

১০। বাংলাদেশে 'নয় এ মধুর খেলার' রচয়িত্রীরা

Dhaka University Institutional Repository

১১। বিজন ভট্টাচার্য

১২। দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি

১৩। আদিবাসী বিদ্রোহের শিল্পরূপ-সন্ধান

১৪। দুই আধুনিক মাতৃতন্ত্রী সাম্যবাদী নাট্যশিল্পী

১৫। জীবনানন্দের মার্কস-লেনিন কমিউনিস্টরা

১৬। ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের উপন্যাসিক আলেজো কার্পেন্টিয়ার

১৭। মার্কোয়েজের অন্যান্য উপন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

রবেশ দাশগুপ্তের অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলি

ক্রমিক নং	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল	সাময়িকী বা সংকলনের নাম
০১	নদীর নাম বাংলা	১৩৭৬ (১৯৬৯)	সূর্য শপথ, পৃ. ২৪-২৫সম্পা: মো: ছাফাতুল্লাহ টুলু, প্রকাশনায় : আদর্শ ছাপাখানা, ৫১ ভজহরি সাহা স্ট্রিট, ঢাকা।
০২	নিজের মনের কাছে প্রশ্ন	১৩৭৬ (১৯৬৯)	ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি, পৃ. ৫-৭, সম্পাদক : মো: মহসীন ভূইয়া, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
০৩	নতুন লেখার অপেক্ষায়	১৩৭৬ (১৯৬৯)	আহুতি, একুশের সংকলন, পৃ. ৫-৭, সম্পা : বিজন ভট্টাচার্য ও অমরজিত মিত্র, প্রকাশক : স্বপন সিংহ বুলু, আবাহন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।
০৪	পরিভাষা কিভাবে জনপ্রিয় হবে	১৩৭৬ (১৯৬৯)	যে পথে নিত্য সূর্যোদয়, পৃ. ৫-৭, তরঙ্গ সম্পাদনা পরিষদ, প্রকা: মিশু।
০৫	মায়ের কোলে শিশু	১৯৭০	বাংলা আমার বাংলা, পৃ. ১০-১১, একুশের সংকলন, সম্পাদক : লিয়াকত উল্লাহ্, সপ্তর্ষি সংঘ, ৩২ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষীবাজার, ঢাকা।
০৬	গণ-নাট্যের প্রয়োজনে	১৯৭০	ফাল্গুনের আর্ট, পৃ. ১২-১৭, সম্পাদক মহসিন শস্ত্রপানি ও যোসেফ শতাব্দী, প্রকাশনায় : উন্মেষ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল	সাময়িকী বা সংকলনের নাম
০৭	সংগ্রামী জীবনের জমা-খরচের খাতায়	১৯৭০	বিদ্রোহী বর্ণমালা, পৃ. ৫০-৫২, সম্পা: আসাদুজ্জামান নূর, প্রকাশক : কামাল উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা।
০৮	ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিত	১৯৭০	স্বাক্ষর, পৃ. ১-৩, সম্পাদক: অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, প্রকাশনা : তরঙ্গ সাংস্কৃতিক সংঘ, বগুড়া।
০৯	একই স্রোতের খাতে	১৯৭১	ইশতেহার, পৃ. ৮-১১, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা।
১০	ধ্বনি প্রতিধ্বনি	১৯৭১	উজ্জীবন, পৃ. ১১-১৪, সম্পা : নূরুল ইসলাম ঢালী, প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ।
১১	আমাদের ঘরের কাছের সাম্প্রতিক কবিতার চুম্বক	১৯৭১	নির্ঝর, পৃ. ৫-৮, সম্পাদক : জয়নুল আবেদীন, প্রকাশক : মোজাফফর আহমেদ, উত্তরা, ঢাকা।
১২	গণমুক্তি আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র	১৯৭১	এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ, পৃ. ১০-১১, সম্পাদক : ডালিয়া সালাহ-উদ্দিন, প্রকাশনায় : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।
১৩	ভাষা আন্দোলনের একটি মূল তাৎপর্য	১৯৭১	মুক্ত যে ভাবনা, পৃ. ১-৪, তরঙ্গ গোষ্ঠী, গোপীবাগ, ঢাকা।
১৪	গণসাহিত্যের ধারা বিচার	১৯৭১	গৈরিক, একুশের সংকলন, সম্পাদক : ফখরুদ্দিন আহমদ, পুনর্মুদ্রণ, অমর একুশের প্রবন্ধ, ২০০০, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল	সাময়িকী বা সংকলনের নাম
১৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি : একটি আত্মসমীক্ষা	১৩৭৮ (১৯৭১)	মূল্যায়ন, ৭ম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ, কলকাতা
১৬	অমরতার সাধনা	১৯৭২	তিমির হননের গান, পৃ. ৫-৬, সম্পাদক: মহিউজ্জামান, প্রকা: পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ শাখা।
১৭	অক্টোবর বিপ্লবের কবিতা-বিচার	১৯৭২	গণসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ৪র্থ : ৫ম সংখ্যা, পৃ. ২২-২৬, সম্পা : আবুল হাসনাত, প্রকাশক : হোসনে আরা ইসলাম।
১৮	কবিতা যেন জীবন্ময়ী নদী	১৩৭৯ (১৯৭২)	গণসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ. ১৩-১৫, প্রাগুক্ত।
১৯	স্বাধীনতার একটি নাম গণমুখী শিক্ষা	১৯৭৩	জাতীয় তরুণ সংঘ সভা, পৃ. ৩-৪, প্রকা: কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিভাগ ২১/২২ হাজারীবাগ, ঢাকা।
২০	একটা আরশিকে নিয়ে	১৯৭৩	রক্ত-স্বাক্ষর, একুশের সংকলন, পৃ. ৯. সম্পাদক : মাসুদউদ্দিন চৌধুরী, নবারুণ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।
২১	আলোর মতো, আগুনের মতো, বিদ্যুতের মতো	১৯৭৩	পাণ্ডুলিপি, একুশের সংকলন, পৃ. ১-২ সম্পাদক : অরুণেশ চৌধুরী, প্রকাশনায়: নবসূর্য সংসদ, ঢাকা।
২২	কমরেড পিকাসো : শিল্পী ও জীবনচরিত	১৩৮০ (১৯৭৩)	গণসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা পৃ. ৭ - ২৩, প্রাগুক্ত।
২৩	স্বাধীনতা আনুক গুণগত উত্তরণ	১৯৭৩	প্রচ্ছদ, পৃ. ৭-৯, সম্পাদক : অরুণ মৈত্র প্রকাশনায় : ইস্টল্যান্ডের কর্মরত সকলের উদ্যোগে।
২৪	মাতৃভাষা ও কতিপয় বিবেচনা	১৯৭৩	ভালবাসার বাগান থেকে, পৃ. ৯-১১ সম্পাদক : হাসান ফেরদৌস, প্রকাশনায়: মেঘদূত সংঘ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল	সাময়িকী বা সংকলনের নাম
২৫	নেরুদা কাব্য-জিজ্ঞাসা	১৯৭৪	গণসাহিত্য, ২য় বর্ষ, ১ম : ২য় সংখ্যা পৃ. ৩০-৪১, প্রাগুক্ত।
২৬	প্রগতির মানসিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব বিচার	১৯৭৫	একদিন চিরদিন, পৃ. ১১-১৪, সম্পাদক : জাহিদ হায়দার, প্রকাশনায় : মোস্তাফিজুর রহমান।
২৭	মাতৃভাষা সাম্যের ভাষা	১৯৭৫	রক্তের সিঁড়ি বেয়ে, পৃ. ৭-৯, সম্পাদক : মতিউর রহমান ভূঁইয়া, প্রকাশনায় : টি,সি,বি, কর্মচারী ও সাংস্কৃতিক পরিষদ।
২৮	মিলিব মিলাবো	১৯৭৫	আলপনা, পৃ. ২৯-৩০, সম্পাদক : রনজিৎ কুমার সেন, প্রকা: কে, এম, মাসুদ, ২৫ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা।
২৯	রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধের বৈপ্লবিকতা	১৯৭৫	সৌরীয় সংলাপ, পৃ. ৪-৫, সম্পা: ম, হামিদ, প্রকাশনায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ।
৩০	যদি একটু ভেবে দেখি	১৯৭৬	শিখীর শিখর, একুশের সংকলন, পৃ. ৮-৯, সম্পাদক : মো: জাকির হোসেন প্রকা: কয়েৎটুলি স্পোর্টিং ক্লাব, ঢাকা।
৩১	শ্রমজীবী বিপ্লবে জাতি প্রশ্নে তত্ত্ব ও কবিতার সহযোগিতা	১৯৭৮	রুশ-ভারতী, বর্ষ-৯৬ সংখ্যা-১, কলকাতা।
৩২	আফ্রিকা মহাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও সাহিত্য	১৯৭৮	রুশ-ভারতী, বর্ষ-১৭ সংখ্যা-৪, কলকাতা।
৩৩	জনতার সংগ্রাম	১৯৮৬	একতা, বর্ষ-১৫, সংখ্যা ৫০, পৃ. ৫ সম্পা : মতিউর রহমান, ২৮/৩/৮৬
৩৪	বাংলাদেশের সাহিত্যে দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতি ধারা	১৩৯৩ (১৯৮৬)	মূল্যায়ন, বর্ষ-১৩, শারদীয় সংখ্যা সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল	সাময়িকী বা সংকলনের নাম
৩৫	সাজ্জাদ জহীরের শেষের দিকের লেখা	১৩৯৩ (১৯৮৬)	মূল্যায়ন, বর্ষ-২২, শারদীয় সংখ্যা, সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ, কলকাতা
৩৬	ফরাসী মহাবিপ্লব : মার্কসীয় নিরিখের পরতে পরতে	১৯৮৯	একতা, পৃ. ৪, সম্পাঃ মতিউর রহমান, তারিখঃ ২৫/৮/৮৯ ইং।
৩৭	অগ্নিযুগের আলেখ্য : সাম্প্রতিক প্রশ্নে	১৩৯৭	মূল্যায়ন,বর্ষ-২৬, শারদীয় সংখ্যা, সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। অধীর দে (ড.) — আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা
১ম খণ্ড ১৯৮৮, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা-৬।

২। আনিসুজ্জামান — পুরোনো বাংলা গদ্য
২য় সং, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩। আনিসুজ্জামান — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
১৯৯৯, বইপাড়া পাবলিকেশন্স, কলকাতা।

৪। আবদুল হক — নিঃসঙ্গচেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫। আবদুল হক — সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ
১৯৬৮, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

৬। আবু হেনা মোস্তফা কামাল — কথা ও কবিতা
১৯৮১, মুক্তধারা, ঢাকা।

৭। আবদুল মান্নান সৈয়দ — বেগম রোকেয়া
১৯৮৩, অবসর প্রকাশনা সংস্থা
৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা।

৮। আবুল কাসেম ফজলুল হক — উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য
১৯৮৮, আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার লেন, ঢাকা।

৯। আবু জাফর শামসুদ্দীন — আত্মস্মৃতি (প্রথম খণ্ড)
১৯৮৯, ঢাকা।

১০। আব্দুস সাত্তার (ড.) — শিল্পকলা যুগে যুগে
২০০৪, অন্তরা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১১।	আহমদ শরীফ	এবং আরো ইত্যাদি ১৯৮৭, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
১২।	আহমদ শরীফ	বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড) ১৯৭৮, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
১৩।	আহমদ সেলিম রেজা	বাংলাদেশের শিল্প ও সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ ২০০৩, গুলশান পাবলিকেশন্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৪।	কামরুদ্দীন আহমদ	পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি ১৩৭৬, স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশনস্, ঢাকা।
১৫।	কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম	চল্লিশের দশকের ঢাকা, ১৯৯৪ নয়া প্রকাশ, ঢাকা।
১৬।	দেবাশিস্ সেনগুপ্ত (সম্পাদক)	প্রগতির পথিকেরা ১৯৯৭, একুশে সংসদ, কলকাতা।
১৭।	বদরউদ্দীন উমর	বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র ১৯৮২, ওজে পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
১৮।	বিশ্বজিৎ ঘোষ	কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা ২০০৩, গ্লোব লাইব্রেরি (প্রা.) লিমিটেড, ঢাকা।
১৯।	বেগম আকতার কামাল	বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প ২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
২০।	রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৯২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
২১।	রফিকউল্লাহ খান	বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২২। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলক) সংসদ বাংলা অভিধান
২০০০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

২৩। সাঈদ-উর-রহমান (সম্পাদক) বাংলাদেশ পঁচিশ বছরের সাহিত্য
২০০৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৪। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি,
১৯৯৩, আফসার ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৫। সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড
২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২৬। সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য
১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২৭। সৈয়দ আকরম হোসেন প্রসঙ্গ : বাংলা কথা সাহিত্য
১৯৯৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

২৮। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ
২০০২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

২৯। সৌমিত্র শেখর (ড.) গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ
২০০২ , অনুসা পাবলিকেশন্স
৮৫/সি, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।

৩০। সৌমিত্র শেখর (ড.) সিভিল সোসাইটি ও অন্যান্য প্রবন্ধ
২০০৪, মনন প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩১। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ড
১৯৮২, তথ্যমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩২। হুমায়ুন আজাদ সীমাবদ্ধতার সূত্র
১৯৯৩, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩।	হুমায়ুন আজাদ	বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় ১৯৯৭, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩৪।	হুমায়ুন আজাদ	শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১৯৮৮, ইউনিভার্সিটি প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৫।	ক্ষেত্র গুপ্ত	বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ১৯৯৮, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা।
৩৬।	Cassel	Encyclopedia of Literature, vol.1. 1953, London.
৩৭।	John L. Stewart (ed.)	The Essay 1952, New York
৩৮।	C. H. Lockitt (ed.)	The Art of the Essayist 1954, London.
৩৯।	William Henry Hudson	An Introduction to the Study of Liberation 1958, London.

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক প্রবন্ধাবলি (পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত)

(১) আবদুর রউফ (সম্পাদক) চতুরঙ্গ
সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ
'প্রবন্ধ : সংজ্ঞা এবং স্বরূপ'
৪৯ বর্ষ, ১৯৮৮।

(২) আবদুল হালিম মানবদরদী বিপ্লবী রণেশ দাশগুপ্ত
সংবাদ সাময়িকী, রণেশ দাশগুপ্ত
স্মরণ সংখ্যা, ১৩ ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ।

(৩) কল্যাণ চন্দ (সম্পাদক) সাহিত্যচিন্তা
রণেশ দাশগুপ্ত ও কিরণশঙ্কর
সেনগুপ্ত স্মরণ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৮
কলকাতা।

(৪) মফিদুল হক রূপবিচারী ও রসসন্ধানী ত্যাগব্রতী ও জ্ঞানব্রতী রণেশ দাশগুপ্ত
সংবাদ সাময়িকী, রণেশ দাশগুপ্ত
স্মরণ সংখ্যা, ১৩ ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ।

(৫) রফিকুল ইসলাম, সাইদ-উর রহমান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক) আশি বছর পূর্তি উৎসব, ২০০৪
আনিসুজ্জামান রচিত প্রবন্ধ 'বাংলা বিভাগের কথা'
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৬) সন্‌জীদা খাতুন রণেশদা-সত্যেনদার কথা
সংবাদ সাময়িকী, রণেশ দাশগুপ্ত
স্মরণ সংখ্যা, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) সন্তোষ গুপ্ত	রণেশদা । । অভিন্ন সত্তায় একজন শিল্পী ও মজুর । চতুরঙ্গ, দৈনিক জনকণ্ঠ ৬ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ।
(৮) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	বুকের ভিতর আগুন ছিল সংবাদ সাময়িকী, রণেশ দাশগুপ্ত, স্মরণ সংখ্যা, ১৩ ই নভেম্বর ১৯৯৭ ।
(৯) সেলিনা হোসেন	মরণ সাগর পারে তুমি যে অমর সংবাদ সাময়িকী, রণেশ দাশগুপ্ত, স্মরণ সংখ্যা, ১৩ ই নভেম্বর ১৯৯৭ ।
(১০) সৌমিত্র শেখর	রণেশদা'র নীরব প্রস্থান চতুরঙ্গ, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ।
(১১) সৌমিত্র শেখর	আনা তো হলোই, কিন্তু লাশ ! সাহিত্য সাময়িকী, বাংলাবাজার পত্রিকা ৮ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ।
(১২) সৌমিত্র শেখর	রণেশ দাশগুপ্তর সঙ্গে শেষ আলাপচারিতা (সাক্ষাৎকার) দৈনিক জনকণ্ঠ সাময়িকী ১৪ ই নভেম্বর, ১৯৯৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) সৌমিত্র শেখর — রণেশ দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' বিবেচনা
সাহিত্য সাময়িকী, দৈনিক সংবাদ
১৫ ই জানুয়ারি, ১৯৯৮ ।

(১৪) সৌমিত্র শেখর — রণেশ দাশগুপ্তর সাহিত্য-বিষয়ক ভাবনা ও মূল্যায়ন
উত্তরাধিকার
বর্ষ- ২৭, সংখ্যা- ১
জানুয়ারি-মার্চ- ১৯৯৯
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০ ।